চাঁদ ও কুরআন
The Moon and The Holy Quran

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ।

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

চাঁদ ও কুরআন

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়

পিস পাবলিকেশন

৪/৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা

ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

পরিবেশনায়

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০।

প্রকাশকাল

জানুয়ারী ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

মাহফুজ কম্পিউটার

ISBN : 984-70256-22

মূল্য : ৫০.০০ টাকা।

The Moon and The Holy Quran, Dr. Zakir Naik Translated By Md. Abdul Qader Mia Published By Md. Rafiqul Islam, Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 50.00

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, তাঁর রাসূলের জন্য সালাত ও সালাম, যিনি বিশ্ব মানবতার জন্য মুক্তিদূত।

অতঃপর বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত ডা. জাকির নাইক-এর এ বইটি অনুবাদ করে বাংলা ভাষি পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে প্রভুর দরবারে সিজদাবনত হচ্ছি। পাঠক মাত্রই বইটি পড়ে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন, মনে হবে যেন বইটি সংগ্রহে রাখার মত। এতে এমন কিছু তথ্য ও সূচী ব্যবহৃত হয়েছে যা সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হবে প্রতিজন পাঠকের নিকট।

বইটি অনুবাদ ও প্রচারের উদ্যোক্তা প্রকাশক ভাই রফিকুল ইসলাম (সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ)কে তাঁর উদ্যোগ গ্রহণ ও আমাদের এর সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য, দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ কামনা করছি এবং তাঁর সদ্য সমাপ্ত হজ্জের পূর্ণ পুরস্কার আল্লাহ যেন দান করেন তার জন্য দুয়া করছি।

পাঠক-পাঠিকাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট এ গুনাহগার অনুবাদকের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে দুয়া চাই। কুরআনের সঠিক মর্যাদা, তাঁকে অনুধাবন এবং মানব জাতির প্রতি তাদের প্রভু প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল-কুরআনকে যদি কিছু লোকও জীবন চলার পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে এ প্রত্যাশায়।

—অনুবাদক

২৭-০১-২০০৯ ইং

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কোলকাতার বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবানীতে কোলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ হজ্জ পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ হয়।

কোলকাতা বইমেলা-২০০৮ এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বইও দেখলাম বেশ ক'টি। তবে সবগুলো বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলা অনুবাদ করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতের নাগালে পৌঁছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোক দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের একটি উসীলা হয়ে যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। তবে প্রকাশকরা বইগুলোর অনুবাদে যথাযথ মান রক্ষা করতে সক্ষম হননি। সে যাই হোক ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক। তবে যারাই তাঁর বইগুলো প্রকাশ করেন তারা যেন তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি বজায় রাখতে প্রয়াসী হন; সেটাই কাম্য।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, তা হলো পিস পাবলিকেশন প্রকাশক হিসেবে নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এমন কিছু সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দীনী দাওয়াতের কাজের উত্তোরত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি।

০১-০২-২০০৯ — প্রকাশক

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বিজ্ঞান, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরিকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আই.আর.এফ) নামক এক দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আই.আর.এফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি, পৃষ্ঠানম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ

করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ পর্ব শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই.সি.এন.এ.ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন, যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চব্বিশ বছর ব্যয় হয়েছে– আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারা বিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেওয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, 'পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্যদিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১ কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২ কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছেমতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরী দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমাদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের ওপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এমন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদ জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের

'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদি সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেওয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টম অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শোরও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের ওপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানীং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশোরও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেন্ট, দ্য ডেইলি মিডডে, দ্য এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'- এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সকল বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখল। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।

চাঁদ ও কুরআন

এখানে আল-কুরআনের তথ্যাবলী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, আল-কুরআনের আদাব, নামসমূহ, পরিভাষা, সকল কিতাবের ওপর আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য, পরিচয় ও কুরআন মাজীদের ব্যাপারে অমুসলিমদের সাক্ষ্য, এসকল ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনের সংশ্লিষ্ট আদাব বা শিষ্টাচার নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. অজু করে নেয়া,

২. মিসওয়াক করা,

৩. আতর-খোশবু লাগান,

৪. যে স্থানে তেলাওয়াত করা হচ্ছে সেখানে ধূমপান না করা,

৫. সম্ভব হলে আগরবাতি জ্বালান,

৬. কুরআন পাক তিলাওয়াতের শুরু ও শেষে চুম্বন করা,

৭. তিলাওয়াতের শুরুতে তাআউজ ও তাসমিয়াহ পড়া,

৮. কুরআন পাক তিলাওয়াতের সময় কিবলামুখী হয়ে আদাবের সাথে (নম্র হয়ে) বসা,

৯. কুরআন পাক পড়ার সময় পা ভেঙ্গে বসা,

১০. ওয়াজ এবং খুতবার সময় শ্রোতাদের দিকে মুখ করে তিলাওয়াত করা,

১১. কুরআন পাক তিলাওয়াতের সময় কাপড় পাক হওয়ার সাথে সাথে সাফ-সুতরাও হওয়া আবশ্যক,

১২. কুরআন শরীফ উঁচু স্থানে– রিহাল কিংবা তাকিয়া ইত্যাদির ওপর রেখে তিলাওয়াত করা,

১৩. তিলাওয়াত করার পর কুরআন শরীফ উঁচু স্থানে রাখা,

১৪. বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা,

১৫. ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করা, আয়াত এবং সূরাগুলোকে ধরাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করা,

১৬. সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করা,

১৭. ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করা,

১৮. তাজভীদ এবং ক্বিরাআতের সাথে তিলাওয়াত করা

১৯. কুরআন শরীফের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অর্থ এবং আশ্চর্য ও বিরল বিষয়াবলীর ওপর চিন্তা-ভাবনা করা,

২০. খুশি ও আনন্দের সাথে তিলাওয়াত করা,

২১. প্রত্যহ তিলাওয়াত করা,

২২. কুরআন শরীফের আয়াত দেখে দেখে তিলাওয়াত করা,

২৩. আরবি নিয়ম-পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করা,

২৪. মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা,

২৫. কুরআন শরীফের ওপর হেলান দেয়া ও তাঁর ওপর ভর দেয়া যাবে না।

২৬. খুশু-খুযুর সাথে (ভয় ও নম্রতার সাথে) তিলাওয়াত করা,

২৭. তিলাওয়াতের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা,

২৮. কুরআন তিলাওয়াতকে উপার্জনের মাধ্যম না বানানো,

২৯. কুরআন শরীফ মুখস্ত করে ভুলে না যাওয়া,

৩০. বিপদজনক স্থান, যেখানে কুরআন শরীফের অবমাননা হতে পারে সেখানে না নেয়া,

৩১. শোর-গোলের স্থান, বাজার এবং মেলায় না পড়া,

৩২. যেখানে অধিক লোকের ভিড় সেখানে নিম্নস্বরে পড়া,

৩৩. অন্যের তিলাওয়াতের অসুবিধার সৃষ্টি না করা,

৩৪. তিলাওয়াতের মাঝে দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা,

৩৫. যদি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যও উঠতে হয় তাহলেও কুরআন শরীফ বন্ধ করে যাওয়া,

৩৬. তিলাওয়াতের মাঝে হাঁচি আসলে তাকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখা, এরপর মুখে হাত রেখে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়া,

৩৭. কুরআন শরীফের কোন আয়াত দ্বারা ভাগ্য গণনা গ্রহণ না করা,

৩৮. বিপদগ্রস্ত সময়ে আয়াতকে ভুল স্থানে ব্যবহার না করা,

৩৯. কুরআন শরীফ আদান-প্রদানের সময় ডান হাত ব্যবহার করা,

৪০. প্রত্যহ কুরআন শরীফ যিয়ারত করা এবং তাকে দেখা,

৪১. কুরআন শরীফের যে ধরনের আয়াত তিলাওয়াতে আসে সে মুতাবিক দুয়া করা অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ এর ওপর জান্নাতে প্রবেশের দুয়া এবং জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি প্রার্থনা করা,

৪২. কোন ক্বিরাআত ও তাজভীদের অভিজ্ঞ শিক্ষক থেকে পড়া,

৪৩. তিলাওয়াত শেষ করে صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ 'আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন' বলা

৪৪. যখন কুরআন শরীফ খতম হবে, তখন পুনরায় শুরু করা,

৪৫. কুরআন পাকের ওপর অন্য কোন কিতাব, কলম, এবং কালি ইত্যাদি না রাখা,

৪৬. কুরআন শরীফের আয়াত পড়ে ফুঁক দেয়া পানি কোন নাপাক স্থানে না ফেলা,

৪৭. কুরআন লেখা তাবীজ অথবা ইসলামী লিখিত অংশ নিয়ে বাথরুমে না যাওয়া,

৪৮. অসঙ্গত দেয়ালে কুরআনের আয়াত না লেখা,

৪৯. কুরআন শরীফের ছেঁড়া পাতাগুলো পুঁতে ফেলা,

৫০. যখন কোন আয়াত তক্তা বা শ্লেটের ওপর লেখা হয় তখন তাকে থু থু দ্বারা না মোছা,

৫১. কুরআন শরীফকে সুন্দর করে আরবি নিয়মে লেখা,

৫২. যে বস্তু হারামের সঙ্গে মিলিত হবে এমন বস্তুতে না লেখা,

৫৩. বড় তক্তির আয়াতকে ছোট তক্তিতে না লেখা,

৫৪. ছাত্রদের নিকট উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত না করা,

৫৫. যখন কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো,

৫৬. যদি তিলাওয়াতের মাঝে বাথরুমে যাবার প্রয়োজন হয় তাহলে কুরআন শরীফ বন্ধ করে যেতে হবে।

৫৭. যদি কুরআন শরীফের কোন শব্দ বুঝা না যায় তাহলে অন্যকে জিজ্ঞেস করা,

৫৮. মাথা থেকে তিলাওয়াত করা,

৫৯. কুরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে প্রয়োজনীয় অংশের ব্যাখ্যার আলোচনা করা,

৬০. সপ্ত তিলাওয়াতের মধ্যে যে পদ্ধতিতে শুরু করা হবে ঐ পদ্ধতিতে শেষ করা,

৬১. বেশি বেশি কুরআন মজীদের তিলাওয়াত করা,

৬২. কুরআন শরীফের সিজদার আয়াত তিলাওয়াত অথবা শুনার পর সিজদা করা,

৬৩. কুরআন শরীফের তিলাওয়াতকে সকল যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করা,

৬৪. কুরআনের উপকারিতাকে ব্যাখ্যা করা, কুরআনের আয়াত দ্বারা আরোগ্য লাভ হলে তা প্রচার করা,

৬৫. কালামে ইলাহীর শক্তি ও প্রভাবের বক্তা হওয়া, এর দ্বারা আরোগ্য লাভ হয় এবং বিবাদ দূরিভূত হয়।

আল-কুরআনের নামসমূহ

একথা খুবই পরিষ্কার যে, কারো সত্তা, ব্যক্তি অথবা বস্তুর অধিক নাম এবং সুন্দর উপাধি এর অধিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ওপর নির্দেশ করে। যেমন– আল্লাহ তায়ালার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, যা তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) মহত্ত্ব ও মর্যাদার দলীল বা প্রমাণ। এভাবে দেখলে কুরআন মাজীদেরও অনেক নাম ও উপাধি রয়েছে যা তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা, মহান শান এবং বুলন্দ স্থানের নির্দেশ করে। নিম্নে আল-কুরআনের আলোকে কুরআনের নাম ও উপাধির উল্লেখ করা হলো–

১. আল-কুরআন ঃ আল-কুরআন কুরকান মাজীদের সত্তাগত নাম। এছাড়াও আল-কুরআনকে 'আল-কুরআন' বলার কতিপয় কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

(ক) এ শব্দ তৈরিকৃত নয় এবং আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবকে বলা হয়। যেমন- তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জীল অন্যান্য আসমানী কিতাবের নাম।

(খ) আল-কুরআন قـرن শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ মিলান। কেননা এর মধ্যে সূরা, আয়াত এবং অক্ষরগুলোকে মিলান হয়েছে। এ কারণে একে القـران বলা হয়।

(গ) القـران শব্দটি قـرء এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ- 'পড়া'। القـران শব্দটি কর্মবাচক অর্থে, যার অর্থ হয়- 'পঠিত কিতাব'। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআন মাজীদ ইলহামী এবং বিনা ইলহামী কিতাবগুলোর মধ্যে সবচে' বেশি পঠিত কিতাব।

২. **আল-কিতাব ঃ** লিখিত অথবা একত্রিত কিতাব, নিম্নলিখিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদকে الكتاب। (আল-কিতাব) বলা হয়।

(ক) الكتاب। শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল যার অর্থ 'একত্রিত করা' ইহা কর্মবাচক مكتوب (লিখিত) অর্থে ব্যবহৃত। 'কিতাব' শব্দ থেকে মেধায় এক সুশৃঙ্খল ও সবিন্যস্ত বস্তুর ধারণা জন্মে। বিশৃঙ্খল পাতাকে কিতাব বলা যায় না। এ দিক থেকে কুরআন মাজীদকে এজন্য 'কিতাব' বলা হয় যেহেতু এর মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ঘটনা, কাহিনী এবং সংবাদগুলোকে সুশৃঙ্খল ও বন্ধনযুক্ত আকারে একত্রিত করা হয়েছে।

(খ) الكتاب। -এর অর্থ যদি 'লিখিত' করা হয়, তাহলে এদিক থেকে হবে যে, কুরআন লাহওহে মাহফুজে লিখিত।

এও সম্ভব যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এটাকে 'কিতাব' এজন্য বলা হয় যে, নবী মুহাম্মদ মুজতবা ﷺ কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। যখন কুরআন মাজীদের কোন অংশ অবতীর্ণ হতো, তখন হুযুর ﷺ অহী লেখক কোন সাহাবীকে ডেকে লেখার নির্দেশ প্রদান করতেন।

(গ) একত্রে সন্নিবেশিত আইন বা বিধানগুলোকেও الكتاب। (সংবিধান) বলা হয়। বরং এ কিতাবকে الكتاب। বলা অধিক তথ্য প্রদান করে। যার মধ্যে বিধানের সাথে সাথে আইনও রয়েছে। কুরআন মাজীদে একে আইনী কিতাব হওয়ার ঘোষণা সূরা নিসার ১০৫ নং আয়াতে এভাবে রয়েছে –

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ـ

'নিশ্চয়ই আমি আপনার ওপরে এ কিতাব সত্যতার সাথে অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পারেন।'

(ঘ) الكتاب। শব্দটি 'চিঠি' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরা নাহল এ মহান রবের ইরশাদ 'আমার পক্ষ থেকে এক সম্মানিত চিঠি এসেছে।' এদিক থেকে 'কুরআন মাজীদ' মহান রব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে সারা পৃথিবীবাসীর জন্য এক খোলা চিঠি।

৩. **আল-মুবীন ঃ** المبين। - শব্দের অর্থ প্রকাশ্য অথবা পরিষ্কার বর্ণনাকারী 'কিতাব'। কুরআন মাজীদ সকল জিনিসকে স্পষ্ট এবং খুবই স্পষ্ট করে বর্ণনাকারী

কিতাব। চিন্তা-ভাবনা ও খালিস নিয়তের সাথে পাঠকারীর জন্য এতে অবশ্যই কোন জড়তা নেই। এর বিধান, আদেশ-নিষেধ খুবই স্পষ্ট। কুরআনকে এজন্যও المبين। বলা হয়। কেননা ইহা সত্যকে বাতিল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে।

৪. **আল-কারীম ঃ** কুরআন মাজীদকে 'আল কারীম' ও বলা হয়। যার অর্থ সম্মান ও মর্যাদাশীল। কুরআন মাজীদের এক আদব ও সম্মান তো এই যে, একে তারতীল ও তাজভীদের সাথে পড়তে হবে এবং একে বুঝে এর দাবি অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে। যে ব্যক্তি কুরআন বিরোধী জীবন-যাপন করে, সে কুরআন মাজীদের সম্মান ও মর্যাদাকারী নয়।

দ্বিতীয় এর প্রকাশ্য আদব এবং এও প্রকৃত বিষয় যে, লোকেরা একে যে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা দেয় তা অন্য কোন কিতাবের ভাগে আসে না।

৫. **কালামুল্লাহ ঃ** কুরআন মাজীদকে কালামুল্লাহও বলা হয়। যার অর্থ আল্লাহর কালাম। এটা কি আল- কুরআনের কম মর্যাদা যে তা সৃষ্টিকর্তা মালিকের বাণী?

৬. **আন-নূর ঃ** কুরআন মাজীদকে 'আননূর' ও বলা হয়। যার অর্থ ঃ আলো। কুরআন মাজীদ মূর্খতা, গোঁড়ামী এবং ভ্রষ্টতার অন্ধকারে প্রকাশ্য আলোর কাজ করে।

৭. **হুদা ঃ** কুরআন মাজীদকে هدى (হুদা) ও বলা হয়। তার অর্থ হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন করা। হুদা শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল, যা কর্তৃবাচক শব্দের অর্থ দান করে। এর অর্থ পথপ্রদর্শক। এ পথপ্রদর্শনের ফল এই যে, কুরআনে বর্ণিত মূল বিষয়াবলী সম্পর্কে শুবা-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কুরআন মাজীদের পথপ্রদর্শন সকল মানবজাতির জন্য, তবে তা থেকে পরিপূর্ণ উপকারিতা বিশ্বাসী এবং মুত্তাকীরাই গ্রহণ করে।

৮. **রহমত ঃ** কুরআন মাজীদ ও কুরআনে হামীদ এর এক নাম 'রহমত' ও। যার অর্থ ঃ বরকত, দয়া ও ভালবাসা। মানবতা, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, কুফরী ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এ অবস্থায় কুরআন-মাজীদ ও ফুরকানে হামীদ কিতাব রহমত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ক্ষতি ও উদ্দেশ্যহীনতার ঝড়-ঝঞ্জার মুকাবিলায় কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ মানুষকে নিজ রহমতের দ্বারা ঢেকে নেয় এবং এ রহমত কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য জীবন-যাপন, সামাজিক ও চারিত্রিক লক্ষ্যহীনতাকে দূর করে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করে।

৯. **আল-ফুরকান ঃ** কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদকে فرقان (ফুরকান) ও বলা হয়ে থাকে। যার অর্থ সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী বাণী। কুরআন মাজীদকে

'ফুরকান' বলার এও একটা কারণ যে, কঠিন পরিবর্তন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের শিক্ষাকে পৃথক করে দিয়েছে। হক ও বাতিল বা সত্য-মিথ্যা, তাওহীদ ও শিরকের মাঝে শক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রকাশ্য চিঠি প্রেরণ করেছেন।

১০. শিফা ঃ কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ এর সম্মানিত এক নাম 'শিফা' ও। যার অর্থ আরোগ্য লাভ; বা নিরাময়। কুরআন মাজীদ রূহ ছাড়াও দেহের জন্যও নিরাময়। এর মধ্যে আশ্চর্যজনক প্রভাব রয়েছে। লাখ-লাখ, কোটি-কোটি, রোগ ব্যাধি এর কিছু কিছু আয়াত ও কিছু কিছু সূরা পড়ে নিরাময় লাভ করা যায়। যেমন– খবর ও রিসালাহর মধ্যে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানে কিছু দিন পূর্বে এক রোগী চিকিৎসার্থে ইংল্যান্ড গিয়েছে ডাক্তারগণ তার রোগকে দুরারোগ্য হিসেবে স্থির করে। তিনি সূরা ইয়াসীন পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করা শুরু করেন এবং কিছু দিনে আরোগ্য লাভ করেন। যখন ডাক্তারগণ এর কারণ জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন এটা কুরআন মাজীদের সূরা ইয়াসীন-এর বরকত। একথা শুনে সূরা ইয়াসীন পড়ে ফুঁক দেয়া পানি। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয় এবং এতে আরোগ্য ও নিরাময়ের জীবাণু মওজুদ ছিল। এ মুজিযা দেখে ইংল্যান্ডের বিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকজন ডাক্তার ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরআন মাজীদের আয়াত ও দুয়া পড়ে ফুঁক দেয়া নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে।

১১. মাওয়িজাহ ঃ কুরআন মাজীদকে 'মাওয়িজাহ' নামেও চিহ্নিত করা হয়। যার অর্থ উপদেশসম্বলিত কিতাব। কুরআন মাজীদ এক দিকে সাধারণ সকল মানুষের জন্য সত্য দ্বীনের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার রয়েছে। অপর দিকে মুমিন মুত্তাকীদের জন্য এ কিতাব হিদায়াত ও উপদেশ। হেদায়াত ও উপদেশ এর পদ্ধতি যৌক্তিক, যে জিনিস পথ প্রদর্শন করে এ জিনিস পথের বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করে। 'মাওয়িজাহ' অর্থ হলো, আমলের ভাল-মন্দের ফল সম্পর্কে এ সংবাদ দেয়া যে, হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তন হবে।

শাব্দিকভাবে وعظ, শব্দের অর্থ হুকুম বা নির্দেশ দেয়া এবং (খারাপ কাজ থেকে) বিরত রাখা। কুরআন ভাল কাজের নির্দেশ দান করে এবং খারাপ কাজ ও ভুল কাজের ফল সম্পর্কে সাবধান করে এবং এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে।

১২. যিকর ঃ কুরআন মাজীদকে যিকরও বলা হয়। এর অর্থ 'স্মরণ'। 'যিকর' তাকে বলে যা মগজে এমনভাবে সংরক্ষিত থাকে যে, ভুলে না যায় এবং স্মরণে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের সংরক্ষণ এ পরিমাণ করেন যে, তা মানুষের বুকের মধ্যে সংরক্ষিত করে দিবে।

দুনিয়ার মধ্যে ইহা একমাত্র কিতাব যাকে মানুষ মুখস্ত করে। আজ পর্যন্ত অগণিত বয়স্ক ও বাচ্চাদের মনের মধ্যে এ কিতাব মওজুদ রয়েছে। এ কারণে যে, চৌদ্দ শতাব্দীর অধিক কাল অতিক্রম করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন কুরআনের কপিতে এক বর্ণেরও পরিবর্তন হয় নি। 'তাজ' এর লেখক আল্লামা ইবন মুকাররাম লিখেন, 'যে কিতাব ধর্মীয় বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং জাতিসমূহের বিধানাবলীর বর্ণনা রয়েছে তাকে 'যিকর' বলে। কুরআন মাজীদে দ্বীনের বর্ণনা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে এজন্য তাকে 'যিকর' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৩. মুবারক ঃ কুরআন মাজীদ ফুরকান হামীদকে 'মুবারক কিতাব' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যার অর্থ বরকতময় কিতাব। বরকত এর অর্থের মধ্যে কল্যাণ, অধিক, বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে কিতাব সঠিক পথ ও হেদায়েত-এর উৎস, বিজ্ঞান ও হিকমতের উৎসস্থল দ্বীনী বর্ণনার তালিকা, আত্মিক ও দৈহিকরোগের ওষুধ, রোগের নিরাময়, পড়ার উপদেশ, নসীহত এবং শিক্ষাগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রকারের সহজ ও আযান। যার শিক্ষা সকল মানুষের জন্য। যার এক হরফ পড়লে দশ নেকী পাওয়া যায়। যার ওপর আমল করার দ্বারা দুনিয়া-আখিরাতে সফলতার সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তা হলো নিশ্চিতভাবেই 'মুবারক' উপাধিধারী কিতাব কুরআন মাজীদ।

১৪. আলী ঃ আরবি ভাষার একটি প্রবাদ রয়েছে- كلام الملوك ملوك الكلام। অর্থাৎ 'বাদশাহর কথা, কথার বাদশাহ' হয়ে থাকে। আল্লাহ বাদশাহগণের বাদশাহ। তাই তার বাণীও বালাগাত ফাসাহাত, ওয়াজ ও নসীহত, কবিতা ও তারতীব, সহজ বর্ণনা ও এজাজ এবং সকল প্রকারের সৌন্দর্যের ভিত্তিতে সকল কালামের থেকে সুউচ্চ ও আলী।

১৫. হিকমত ঃ কুরআন মাজীদ ও ফুরকান হামীদকে 'হিকমত' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। হিকমত বলতে সাধারণভাবে বিজ্ঞতার বর্ণনাকে বলে, যাতে তার বুঝের মধ্যে শক্তি, ফায়সালা, ন্যায়বিচার, সুন্দর এবং সুসম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কুরআনে হাকীমকে 'হিকমতে বালিগা' বলা হয়। কেননা ইহা মানবের সকল ফায়সালা, এ সকল সম্পর্ক এবং ন্যায়বিচারের স্থলে পৌঁছায়, যা তার মনযিল। হিকমতের মধ্যে শক্তির উপাদানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ইসলামী উপাদান রাষ্ট্রীয় বিধানকে এক প্রজ্ঞাময় বিধানে পরিণত করে।

১৬. হাকীম ঃ কিতাবে হাকীম অর্থাৎ প্রজ্ঞাময় কিতাব, হাকীম যদি হিকমত ওয়ালা কিতাবের অর্থ দান করে, তাহলে হিকমত বা প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটবে। আর যদি

হাকীম মুহকাম (মজবুত, টেকসই এবং শক্ত) অর্থে হয়, তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য এ কিতাব যার মধ্যে হালাল-হারাম, হদ এবং বিধান মুজবুতভাবে রয়েছে। এর মধ্যে কখনো পরিবর্তন আসবে না এবং যা ভুল এ বৈপরীত্য থেকে পবিত্র কিতাব, একে কিতাবে হাকীম বলা হয়। কুরআন মাজীদ যেহেতু সকল ভাল গুণে গুণান্বিত। তাই একে 'কিতাবে হাকীম' বলা হয়।

১৭. মুহাইমিন ঃ মুহাইমিন শব্দের অর্থ- পর্যবেক্ষক, সংরক্ষক ও সাক্ষ্য প্রদানকারী। অন্যান্য আসমানী কিতাবের সঙ্গে কুরআন মাজীদের বিশেষত্ব এই যে, এ কিতাব সেগুলোর জন্য সংরক্ষক এবং সাক্ষ্যদাতা। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে যেহেতু পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে, সে জন্য অবিকৃত কুরআন মাজীদ তাদের মধ্যে ফায়সালা দানকারী কিতাব।

১৮. হাবলুল্লাহ ঃ হাবলুল্লাহ (حبل الله) শব্দের অর্থ আল্লাহর রশি যে কুরআন মাজীদকে শক্ত করে ধরে এবং এর ওপর আমল করতে শুরু করে। যে হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন অর্জন করবে এবং তার আল্লাহ তায়ালার মারেফাত হাসিল হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়া আখিরাতের সফলতাও নসীব হবে। আল কুরআন এ জন্য হাবলুল্লাহ। যেহেতু এ কিতাব আল্লাহ তায়ালার মারিফাত পর্যন্ত পৌছানোর কিতাব।

১৯. সিরাতুল মুস্তাকীম ঃ সিরাতুল মুস্তাকীম অর্থ 'সোজা রাস্তা'। কুরআন মাজীদ এমন এক সোজা রাস্তা যা জান্নাত পর্যন্ত যায়, এর মধ্যে কোন ক্রুটি নেই। নিঃসন্দেহে যে কুরআনের বিধানাবলীর ওপর আমল করে সে সিরাতুল মুস্তাকীম এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২০. আল কাইয়্যিম ঃ কুরআন মাজীদকে 'কাইয়্যিম নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যার অর্থ সোজা ও পরিষ্কার হওয়া। কুরআন মাজীদ মিথ্যা, ব্যভিচার, গীবত, চোগলখুরী এবং সকল ধরনের গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের নির্দেশ প্রদান করে। এ কারণে একে الكتاب القيم -'আল-কিতাবুল কাইয়্যিম' বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদ আল্লাহ তায়ালার অবতারিত কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ কিতাব এবং এটাই একমাত্র কিতাব যা যেকোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ব্যতীত নিজে নিজেই মওজুদ ও সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন একটি শব্দেরও পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি। ইহা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহ তায়ালার অবতারিত। স্বয়ং কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদে সুস্পষ্টভাবে আছে যে, এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা নিজ জিম্মায় গ্রহণ

করেছেন। শুধু শব্দাবলীই নয় বরং এর উচ্চারণ এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা এর জিম্মাদারীও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন। রাসূল ﷺ এরও এ স্বাধীনতা ছিল না যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে এক শব্দ কম-বেশি করবেন।

দুনিয়ার কোন ভাষায় এমন কোন ধর্মীয় পুস্তক নেই, যা শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত শব্দ ও অর্থের দিক থেক্রে কোন রূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়া সম্পূর্ণরূপে বর্তমান আছে। এ মুজিযাপূর্ণ মর্যাদা শুধু কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদের জন্য প্রযোজ্য। এ ছাড়া অন্য কোন কিতাব এ মর্যাদা লাভ করতে পারে নি।

কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণ

কুরআন মাজীদ খণ্ডাকারে অবতীর্ণ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একে লিখিয়ে নিতেন এবং সাহাবীগণ এর তালীম দিতেন। সাহাবীগণ কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ শুধু মুখস্থই করতেন তা নয় বরং যারা লেখা-পড়া জানতেন তারা লিখে হিফাযত করে নিতেন। স্বয়ং দুজাহানের বাদশাহ নবী কারীম ﷺ অবতারিত আয়াতের লিখনির নির্দেশ দিতেন যে, ইহা অমুক সূরার আয়াত এবং এ অংশ অমুক আয়াতের পরে এবং অমুক আয়াতের পূর্বে লেখ। এভাবে যখনই কোন আয়াত অবতীর্ণ হত তখনই একই দিনের মধ্যে এর অনেক হাফিজ হয়ে যেতেন এবং লিখিত কপিও তৈরি হয়ে যেত।

যদি কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ সম্পূর্ণ একবারে অবতীর্ণ হতো অথবা লিখিত কিতাবাকারে অথবা তক্তির আকারে আসত তাহলে এর সংরক্ষণ এরূপ হতো না, যেরূপ আজ আছে। কে সারা কুরআন শরীফ একদিনে মুখস্থ করত? এবং কে এক দিনে বিভিন্ন কপি তৈরি করত? অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের পর আর কোন কিতাব নাযিল করবেন না এবং রাসূল ﷺ এরপর আর কোন নবী প্রেরণও করবেন না। এজন্য কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদকে নাযিল করতে মুখস্থ করতে এবং লিখিত আকারে সংরক্ষিত রাখতে অসাধারণ পন্থা অবলম্বন করেছেন। নামাজের মধ্যে কুরআন মাজীদের অংশ পড়া বাধ্যতামূলক ও ফরজ করে দিয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের সাহাবীগণের এ ধরনের আগ্রহ ছিল যে, যে পরিমাণ কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হতো, তা নিজে সালাতের মধ্যে বারবার পড়তেন। শুধু পুরুষই নয়; মহিলা সাহাবীগণও কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদকে মুখস্থ করে নিতেন। যিনি লেখা-পড়া জানতেন তিনি তা লিখে রাখতেন।

রাসূল ﷺ এর ইন্তিকালের সময় পূর্ণ কুরআন শরীফ লিখিত অবস্থায় ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর একে এক কিতাবের আকারে সূরাগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়। এ কাজের আঞ্জাম হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে করা হয়। হযরত ওমর

ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালেও কুরআনে মাজীদ এর বহু কপি লেখা হয় এবং হযরত উসমান গণী (রা) কুরআন মাজীদের নতুন বিন্যাস করেন। তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে কৃত কপিগুলোকে দূর-দূরান্তের রাজ্যগুলোতে পৌছান। এক কপি মদীনা মুনাওয়ারায় রাখেন এবং বাকী কপিগুলো মক্কা মুকাররমা, বসরা, কুফা, সিরিয়া, ইয়ামন এবং বাহরাইনে পাঠান।

কুরআন মাজীদ আরবে অবতীর্ণ হয়। আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়। তারা আরবি ভাষা জানতেন। এজন্য ইরাবের (যের, যবর, পেশ) প্রয়োজন বোধ করতেন না। অথচ এরপর ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং অনারবীগণ ইসলাম গ্রহণ করেন, যেহেতু আরবিরা আরবি কম জানতেন এবং কুরআনে ইরাব (যের, যবর, পেশ)ও ছিল না এজন্য কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ইরাবের ভুল-ভ্রান্তি হতে থাকে। এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৮৬ হিজরীতে কুরআন শরীফে ইরাব বা হরকত সন্নিবেশ করেন। এভাবে বর্তমান আকৃতি লাভ করেন।

কুরআনের বিন্যাস ঃ

কুরআন মাজীদে

– ১১৪টি সূরা

– ৬৬৬৬ টি আয়াত

– ৩০ পারা

– ৭ মঞ্জিল

– ৬০ হিযব

– ৫৪০ রুকু, এভাবে বিন্যাস করা হয়েছে।

সূরাগুলো অবতীর্ণের ধারা

এখন কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদ এর সূরাগুলোর অবতীর্ণ হওয়ার হিসাব অনুযায়ী, স্থান-কাল এজন্য উল্লেখ করা হলো, যাতে পাঠকগণ এ কথা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন যে, সূরাগুলো কোন ধারা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন নির্দেশ ও নিষেধগুলো প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোনগুলো পরে। অপর পাতাগুলোতে এ সংক্রান্ত ছক দেয়া হলো–

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণের স্থান
আলাক	১	৯৬	১৯	হিজরতের পূর্বে	মক্কা
মুদ্দাচ্ছির	২	৭৪	৫৬	ঐ	ঐ
মুজ্জাম্মিল	৩	৭৩	২০	ঐ	ঐ
দুহা	৪	৯৩	১১	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণের স্থান
ইনশিরাহ	৫	৯৪	৮	ঐ	ঐ
ফালাক	৬	১১৩	৫	ঐ	ঐ
নাস	৭	১১৪	৬	ঐ	ঐ
ফাতিহা	৮	১	৭	ঐ	ঐ
কাফিরুন	৯	১০৯	৬	ঐ	ঐ
ইখলাস	১০	১১২	৪	ঐ	ঐ
লাহাব	১১	১১১	৫	ঐ	ঐ
কাওছার	১২	১০৮	৩	ঐ	ঐ
হুমাযাহ	১৩	১০৪	৯	ঐ	ঐ
মাউন	১৪	১০৭	৭	ঐ	ঐ
তাকাসুর	১৫	১০২	৮	ঐ	ঐ
লাইল	১৬	৯২	২১	ঐ	ঐ
কলম	১৭	৬৮	৫২	ঐ	ঐ
বালাদ	১৮	৯০	২০	ঐ	ঐ
ফীল	১৯	১০৫	৫	ঐ	ঐ
কুরাইশ	২০	১০৬	৪	ঐ	ঐ
ক্বদর	২১	৯৭	৫	ঐ	ঐ
ত্বারিক	২২	৮৬	১৭	ঐ	ঐ
শামস	২৩	৯১	১৫	ঐ	ঐ
আবাসা	২৪	৮০	৪২	ঐ	ঐ
আলা	২৫	৮৭	১৯	ঐ	ঐ
ত্বীন	২৬	৯৫	৮	ঐ	ঐ
আসর	২৭	১০৩	৩	ঐ	ঐ
বরুজ	২৮	৮৫	২২	ঐ	ঐ
কারিয়্যাহ	২৯	১০১	১১	ঐ	ঐ
যিলযাল	৩০	৯৯	৮	ঐ	ঐ
ইনফিতার	৩১	৮২	১৯	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণের স্থান
তাকভীর	৩২	৮১	২৯	ঐ	ঐ
ইনশিকাক	৩৩	৮৪	২৫	ঐ	ঐ
আদিয়াত	৩৪	১০০	১১	ঐ	ঐ
নাযিয়াত	৩৫	৭৯	৪৬	ঐ	ঐ
মুরসালাত	৩৬	৭৭	৫০	ঐ	ঐ
নাবা	৩৭	৭৮	৪০	ঐ	ঐ
গাশিয়াহ	৩৮	৮৮	২৬	ঐ	ঐ
ফজর	৩৯	৮৯	৩০	ঐ	ঐ
কিয়ামাহ	৪০	৭৫	৪০	ঐ	ঐ
তাতফীফ	৪১	৮৩	৩৬	ঐ	ঐ
হাক্কাহ	৪২	৬৯	৫২	ঐ	ঐ
যারিয়াত	৪৩	৫১	৬০	ঐ	ঐ
তুর	৪৪	৫২	৪৯	ঐ	ঐ
ওয়াকিয়াহ	৪৫	৫৬	৯৬	ঐ	ঐ
নাজম	৪৬	৫৩	৬২	ঐ	ঐ
মায়ারিজ	৪৭	৭০	৪৪	ঐ	ঐ
রাহমান	৪৮	৫৫	৭৮	ঐ	ঐ
কামার	৪৯	৫৪	৫৫	ঐ	ঐ
ছাফফাত	৫০	৩৭	১৮২	ঐ	ঐ
নূহ	৫১	৭১	২৮	ঐ	ঐ
দাহর	৫২	৭৬	৩১	ঐ	ঐ
দুখান	৫৩	৪৪	৫৯	ঐ	ঐ
ক্বাফ	৫৪	৫০	৪৫	ঐ	ঐ
ত্বহা	৫৫	২০	১৩৫	ঐ	ঐ
শুয়ারা	৫৬	২৬	২২৭	ঐ	ঐ
হিজর	৫৭	১৫	৯৯	ঐ	ঐ
মারইয়াম	৫৮	১৯	৯৮	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণের স্থান
ছোয়াদ	৫৯	৩৮	৮৮	ঐ	ঐ
ইয়াসীন	৬০	৩৬	৮৩	ঐ	ঐ
যুখরূফ	৬১	৪৩	৮৯	ঐ	ঐ
জ্বিন	৬২	৭২	২৮	ঐ	ঐ
মুলক	৬৩	৬৭	৩০	ঐ	ঐ
মুমিনূন	৬৪	২৩	১১৮	ঐ	ঐ
আম্বিয়া	৬৫	২১	১১২	ঐ	ঐ
ফুরকান	৬৬	২৫	৭৭	ঐ	ঐ
বনী ইস্রাইল	৬৭	১৭	১১১	ঐ	ঐ
নামল	৬৮	২৭	৯৩	ঐ	ঐ
কাহফ	৬৯	১৮	১১০	ঐ	ঐ
সাজদাহ	৭০	৩২	৩০	ঐ	ঐ
হামীম সাজদাহ	৭১	৪১	৫৪	ঐ	ঐ
জাছিয়াহ	৭২	৪৫	৩৭	ঐ	ঐ
নাহল	৭৩	১৬	১২৮	ঐ	ঐ
রূম	৭৪	৩০	৬০	ঐ	ঐ
হূদ	৭৫	১১	১২৩	ঐ	ঐ
ইবরাহীম	৭৬	১৪	৫২	ঐ	ঐ
ইউসুফ	৭৭	১২	১১১	ঐ	ঐ
মুমিন	৭৮	৪০	৮৫	ঐ	ঐ
কাসাস	৭৯	২৮	৮৮	ঐ	ঐ
যুমার	৮০	৩৯	৭৫	ঐ	ঐ
আনকাবুত	৮১	২৯	৬৯	ঐ	ঐ
লুকমান	৮২	৩১	৩৪	হিজরতের পূর্বে	মাক্কী
শুরা	৮৩	৪২	৫৩	ঐ	ঐ
ইউনুস	৮৪	১০	১০৯	ঐ	ঐ
সাবা	৮৫	৩৪	৫৪	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণের স্থান
ফাতির	৮৬	৩৫	৪৫	ঐ	ঐ
আরাফ	৮৭	৭	২০৬	ঐ	ঐ
আহ্কাফ	৮৮	৪৬	৩৫	ঐ	ঐ
আনআম	৮৯	৬	১৬৬	ঐ	ঐ
রায়াদ	৯০	১৩	৪৩	ঐ	ঐ
বাকারা	৯১	২	২৮৬	হিজরতের পরে	মদীনা
বাইয়িনাহ	৯২	৯৮	৮	ঐ	ঐ
তাগাবুন	৯৩	৬৪	১৮	ঐ	ঐ
জুমুয়াহ	৯৪	৬২	১১	ঐ	ঐ
আনফাল	৯৫	৮	৭৫	ঐ	ঐ
মুহাম্মাদ	৯৬	৪৭	৩৮	ঐ	ঐ
আলে ইমরান	৯৭	৩	২০০	ঐ	ঐ
ছফ	৯৮	৬১	১৪	ঐ	ঐ
হাদীদ	৯৯	৫৭	২৯	ঐ	ঐ
নিসা	১০০	৪	১৭৭	ঐ	ঐ
তালাক	১০১	৬৫	১২	ঐ	ঐ
হাশর	১০২	৫৯	২৪	ঐ	ঐ
আহযাব	১০৩	৩৩	৭৩	ঐ	ঐ
মুনাফিকুন	১০৪	৬৩	১১	ঐ	ঐ
নূর	১০৫	২৪	৬৪	ঐ	ঐ
মুজাদালাহ	১০৬	৫৮	২২	ঐ	ঐ
হাজ্জ	১০৭	২২	৭৮	ঐ	ঐ
ফাতাহ	১০৮	৪৮	২৯	ঐ	ঐ
তাহরীম	১০৯	৬৬	১২	ঐ	ঐ
মুমতাহিনা	১১০	৬০	১৩	ঐ	ঐ
নাছর	১১১	১১০	৩	ঐ	ঐ
হুজুরাত	১১২	৪৯	১৮	ঐ	ঐ
তাওবাহ	১১৩	৯	১২৯	ঐ	ঐ
মায়িদাহ	১১৪	৫	১২০	ঐ	ঐ

নোট ঃ কিছু কিছু সূরা অবতীর্ণের স্থানকালের ব্যাপারে মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। কারো কারো মতে সেগুলো মক্কায়, কারো কারো মতে মদীনায় অবতীর্ণ। এ মতানৈক্যের মূল কারণ এই যে, ঐ সকল সূরার কিছু অংশ হিজরতের পূর্বে এবং অপর অংশ হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। মতানৈক্যের কারণ এটাই।

কতিপয় পরিভাষা

আল-কুরআন ঃ কুরআন আরবি ভাষার একটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ-পড়া। পড়া যিনি জানেন তার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে এ নামে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ নাম এসেছে। এ ছাড়াও কুরআন মাজীদের আরো ৮৫ টি গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন– আল বায়ান, আল-বুরহান, আযযিকর, তিবইয়ান ইত্যাদি। এ নামও কুরআন মাজীদে এসেছে।

সূরাহ ঃ সূরাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ পরিবেষ্টিত বাগান এবং শহর। কুরআন মাজীদ তাঁর ১১৪টি পৃথক পৃথক অংশের জন্য এ নাম নির্দিষ্ট করেছেন। এ পরিভাষা স্বয়ং কুরআন মাজীদই নির্ধারণ করেছেন। কোন মানুষ কুরআন মাজীদের সূরার জন্য এ নাম নির্ধারণ করে নি। এ নাম ২নং সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত ঃ আয়াত এর শাব্দিক অর্থ পতাকা, বিশেষ চিহ্ন। এগুলো কুরআনের একটা ক্ষুদ্র অংশের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ নামও স্বয়ং কুরআন মাজীদ নিজের জন্য ব্যবহার করেছে। آية শব্দের বহুবচন آيات আসে। কুরআনে স্বয়ং নিজের জন্য সূরা মুহাম্মাদের ২০ নং আয়াতে এবং সূরা আনকাবুতের ৪৯ নং আয়াতে আয়াত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ তিনটি পরিভাষাই আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ব্যবহার করেছেন। ছোট অংশের জন্য 'আয়াত'। পূর্ণ অংশের সম্বোধনের জন্য 'সূরা' এবং পূর্ণ কিতাবের জন্য 'কুরআন' মাজীদ শব্দ স্বয়ং রাব্বুল ইজ্জত বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। কোন মানুষের মেধা, মগজ, বা চিন্তা-ভাবনার কোন অন্তর্ভুক্তি এর মধ্যে নেই।

ওহী ঃ ওহী অবতরণের শুরু হয় মাহে রমজানুল মুবারক এ রাসূল ﷺ এর জন্মের ৪১ সাল মুতাবিক ৬১০ ঈসায়ী মাগরিবের পর রাসূল ﷺ মক্কা মুকাররমা খানায়ে কাবার তিন মাইল দূরে ওয়াদী মুহাসসাব এর পাহাড়ের গুহায় মাবুদের স্মরণে মশগুল ছিলেন, যাকে তখন 'হিরা' পর্বত বলা হয়। আজ সকলে 'জাবালে নূর' বা নূর

পর্বত বলে। বর্তমানে 'মুহাসসাব' উপত্যকায় বড় বড় মহল্লা তৈরি হচ্ছে এবং এ উপত্যকাকে 'মুয়াবাদা' বলা হয়।

প্রথমে যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলো হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। এরপর বিভিন্ন সময়ে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হতে থাকে। কখনো কোন সূরা পূর্ণও অবতীর্ণ হয় কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই অল্প অল্প অংশ অবতীর্ণ হতে থাকে এবং রাসূল ﷺ মহান প্রভুর নির্দেশনা অনুযায়ী এ অবতীর্ণ আয়াতগুলো সূরার মধ্যে তারতীব অনুযায়ী বিন্যাস করে লিখিয়ে নেন। এমনকি সর্বশেষ অহী আরাফার ময়দানে সন্ধ্যার সময় শুক্রবারে ৯ যিলহজ্জ ১০ম হিজরী মুতাবিক ৬৩২ ঈসায়ীতে অবতীর্ণ হয়। এ সর্বশেষ ওহী সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত। এভাবে পূর্ণ কুরআন মাজীদের অবতরণে পূর্ণ ২২ বছর ২ মাস সময় লাগে। যেহেতু রাসূল ﷺ ৫৪ বছর বয়সে মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত করেন এবং সেখানে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এজন্য কুরআন নাযিলের সময় দু অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম মাক্কী এবং দ্বিতীয় মাদানী।

মাক্কী দাওর ঃ জন্মের ৪১ বছরের রমজানুল মুবারক থেকে জন্মের ৫৪ বছরের রবিউল আওয়াল পর্যন্ত অর্থাৎ ১২ বছর ৫ মাস সময়ে কুরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয় তাকে মাক্কী বলা হয়। মক্কা মুকাররমায় সর্ব প্রথম সূরা আলাক এবং সর্বশেষ সূরা মুতাফফিফীন অবতীর্ণ হয়।

মাদানী দাওর ঃ ৫৪ জন্ম সালের রবিউল আউয়াল থেকে (যে সময় হুজুর ﷺ এর বয়স ৫৪ বছর ছিল) থেকে ৬৩ জন্ম বর্ষের নবম যিলহজ্জ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ বছর ৯ মাস যে আয়াত বা সূরাগুলো অবতীর্ণ হয় তাকে মাদানী বলা হয়।

এভাবে পূর্ণ কুরআন শরীফের ১১৪ সূরার মধ্যে ৯৩টি সূরা মাক্কী এবং ২১টি মাদানী। মদীনায় প্রথম সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয় এবং সর্বশেষ সূরা নাসর অবতীর্ণ হয়।

মানযিল ঃ কুরআন মাজীদে বর্তমানে সাতটি মঞ্জিল-এর চিহ্ন প্রান্ত সীমায় দেখা যায়। এ বিভক্তি হযরত উসমান (রা)-এর সাপ্তাহিক তিলাওয়াতের চিহ্ন থেকে বানানো হয়েছে। আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা) সপ্তাহে একবার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। এ ভাগ নিম্নলিখিত নিয়মে–

শনিবার ১ম মঞ্জিল সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসা

রোববার ২য় মঞ্জিল সূরা মায়িদা থেকে সূরা তাওবাহ

সোমবার ৩য় মঞ্জিল সূরা ইউনুস থেকে সূরা নাহল

মঙ্গলবার ৪র্থ মঞ্জিল সূরা বনী ইসরাঈল থেকে সূরা ফুরকান

বুধবার ৫ম মঞ্জিল সূরা শুয়ারা থেকে সূরা ইয়াসীন

বৃহঃ বার ৬ষ্ঠ মঞ্জিল সূরা ছফফাত থেকে সূরা হুজুরাত

শুক্রবার ৭ম মঞ্জিল সূরা কাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

পারা ঃ সাহাবীগণের সময় এক মাসে পূর্ণ ত্রিশ দিনে একবার খতম করার জন্য কুরআনকে পারায় বিভক্ত করেন। যদি প্রতিদিন এক পারা তিলাওয়াত করা হয় তা হলে ত্রিশ দিনে পূর্ণ খতম করা যায়। একে জুয বা পারা বলা হয়। ইহা কাছাকাছি সংখ্যক আয়াতকে গণনা করে তৈরি করা হয়েছে। এরপর প্রত্যেক পারাকে কাছাকাছি দু'অংশে ভাগ করা হয়েছে এবং তার নাম দেয়া হয়েছে হিজব (حزب) এভাবে কুরআন শরীফ ত্রিশ পারা (জুয) এবং ষাট হিজব হয়েছে। প্রত্যেক পারাকেও বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এক চতুর্থাংশ, অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ এ শব্দগুলো প্রান্তে পাওয়া যায়। যার অর্থ পারার এতটুকু পর্যন্ত অংশ আপনি পড়েছেন। যদি আপনি এক চতুর্থাংশে পর্যন্ত পৌছেন তাহলে দাঁড়ালো আপনি এক পারার চার অংশের এক অংশ তিলাওয়াত করেছেন। যদি আপনি অর্ধেক পর্যন্ত পৌছেন, তাহলে দাঁড়ালো আপনি চার অংশের দুই অংশ তিলাওয়াত করেছেন। যদি এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পৌছেন, তাহলে অর্থ দাঁড়ালো আপনি চার অংশের তিন অংশ তিলাওয়াত করেছেন আর মাত্র এক অংশ বাকী রইলো।

তাবেয়ীগণের (র) জামানায় পাঁচ আয়াত পরপর চিহ্ন দেয়া হয়েছিল এবং একে 'খুমাসী' নাম দেয়া হয়। কেউ আবার ১০ আয়াত পরপর চিহ্ন দিয়েছে, তারা 'আশারিয়াত' নাম দিয়েছেন। অতঃপর পাক ভারতের হাফিজগণ নিজেদের কপির ওপর রুকুর চিহ্ন লাগিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, রমজানে তারাবীহ পড়ার সময় এক রাকআতে এ পরিমাণ আয়াত পড়বেন। এভাবে রমজানের সাতাশ রাতের প্রতি রাতে বিশ রাকআত করে সম্পূর্ণ ৫৪০ রুকু হলো।

হুরূফে মুকাত্তায়াত ঃ কুরআন মাজীদের ২৯ সূরার প্রথমে একক বর্ণমালা রয়েছে যাকে 'হুরূফে মুকাত্তায়াত' বা বিচ্ছিন্ন হরফ বলা হয়। যেমন– كهيعص . الم . حم . الر। ইত্যাদি।

এগুলোকে এককভাবেই তিলাওয়াত করা হয়। এ সকল একক হরফ আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল এর মাঝে ইঙ্গিত ছিল।

ওয়াকফের চিহ্ন ঃ প্রত্যেক ভাষাভাষি যখন কথা বলে তখন কোথাও একটুও থামে না, কোথাও কম থামে, কোথাও বেশি থামে। এ ধরনের থামা না থামার বর্ণনা সঠিকভাবে করা এবং তা সঠিকভাবে বুঝার প্রয়োজন রয়েছে। কুরআন মাজীদের

বাণী কথাবার্তার মতই, এজন্য জ্ঞানবান লোকেরা এতে থামা না থামার চিহ্ন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকে কুরআন মাজীদের থামার চিহ্ন বলা হয়।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারীদের এসকল চিহ্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা আবশ্যক।

ه ঃ যেখানে বক্তব্য পূর্ণ হয়ে যায়, সেখানে ছোট একটা বৃত্ত লেখা থাকে। এটা মূলতঃ গোল (ة) এবং ইহা পূর্ণ ওয়াকফের চিহ্ন অর্থাৎ এখানে থামা উচিত। এখন ة লেখা হয় না বরং ছোট একটু বৃত্ত রাখা হয়, এ চিহ্নকে আয়াতের চিহ্ন বলা হয়।

م ঃ ইহা ওয়াক্‌ফ লাযিমের চিহ্ন। এরপর অবশ্যই থামতে হবে। যদি না থামে তাহলে অর্থ এদিক সেদিক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর উদাহরণ বাংলায় যদি বুঝতে চান তাহলে ধরুন, কাউকে বলা হলো। উঠ, বসো না। যাতে উঠার আদেশ এবং বসতে নিষেধ করা হয়েছে, এখানে 'উঠ' এরপর থামা আবশ্যক। যদি এখানে না থামা হয় তাহলে উঠ বসো না, যার মধ্যে উঠা বসা উভয়টিকেই নিষেধ করা হয়েছে (যেন ডাক্তারের নিষেধ) অথচ এটা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। এরূপভাবে কুরআন শরীফ ওয়াকফে লাযিম এর স্থলে না, থামলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ط ঃ ওয়াকফে মুতলাক এর আলামত। এখানে থামা উচিত, তবে এ চিহ্ন ঐ স্থানে বসে যেখানে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় নি এবং আরো কিছু বলতে চাচ্ছেন।

ج ঃ ওয়াকফে জায়েয এর চিহ্ন। অর্থাৎ এ স্থানে থামা ভাল এবং না থামাও জায়েয আছে।

ز ঃ ওয়াকফে মুজাওয়াজ এর আলামত। এখানে না থামা ভাল।

ص ঃ ওয়াকফে মুরাখখাস এর আলামত বা চিহ্ন। এখানে মিলিয়ে পড়া উচিত, তবে যদি কেউ হঠাৎ করে থেমে যায়, তাহলে অবকাশ আছে। ص এর ওপর মিলিয়ে পড়া ز এর চেয়েও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

صلے ঃ 'আল অসলো আওলা' এর সংক্ষিপ্তরূপ, এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

ق ঃ قيل عليه الوقف এর সংক্ষিপ্ত রূপ। (দুর্বল কওল অনুযায়ী) এখানে থামা উচিত।

صل ঃ কখনো কখনো মিলিয়ে পড়া হয় তার চিহ্ন। এখানে থামা না থামা উভয়টি করা জায়েয, তবে থামা উত্তম।

قف ঃ এর অর্থ থামো। এ চিহ্ন ঐ স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে পাঠকের না থামার সম্ভাবনা রয়েছে।

س ঃ (سكت) সাকতার চিহ্ন। এখানে কিছুটা থামতে হবে, তবে শ্বাস বাকী রাখতে হবে।

وقفه ঃ দীর্ঘ সাকতার আলামত। এখানে সাকতার অধিক থামা উচিত, তবে শ্বাস ছাড়া যাবে না। সাকতা এবং ওয়াকফের মধ্যে এ পার্থক্য রয়েছে যে সাকতার মধ্যে কম পরিমাণ থামতে হবে এবং শ্বাস বাকী রাখতে হবে। ওয়াকফের মধ্যে বেশি থামতে হবে এবং নিঃশ্বাসও ছেড়ে দিবে।

لا ঃ لا এর অর্থ নাই। ইহা কখনো কখনো ওয়াকফের চিহ্নের ওপর আবার কখনো কখনো ইবারতের মধ্যেও বসে। ইবারতের মধ্যে বসলে কখনো থামা যাবে না। আয়াতের চিহ্নের ওপর বসলে থামা না থামার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে থামা ভাল, কারো মতে না থামা ভাল। তবে থামা না থামার মধ্যে মূলত কোন সমস্যা নেই।

ك ঃ كذلك এর চিহ্ন। অর্থাৎ ঐরূপ। অর্থাৎ যে চিহ্ন পূর্বে গিয়েছে, এখানেও সেই চিহ্ন বুঝতে হবে।

অনুবাদকের নোট ঃ ওয়াকফের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে এসেছেন আমার উস্তাদজী মাওঃ এ, কে, এম, শাহজাহান। যিনি তালীমুল কুরআনের কেন্দ্রীয় প্রধান উস্তাদ এবং টিভি চ্যানেল ATN এর নিয়মিত শিক্ষক। তাঁর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হলো−

ওয়াকফ চিহ্নকে দ্বায়েরা বলে।

দ্বায়েরার ওপর মীম থাকলে শুধু মীম থাকলে ওয়াকফ করতেই হবে, তাই তাকে ওয়াকফ লাযিম বলে। ত্ব জীম যা সোয়াদ, সেলে, কিফ, ক্বফ, দ্বায়েরার ওপর লাম আলিফ থাকলে শুধু দ্বায়েরা থাকলে ওয়াকফ করা না করা উভয়টা চলে। শুধু লাম আলিফ থাকলে ওয়াক্‌ফ করা নিষেধ।[১]

কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ঃ

১. বাক্যের সংখ্যা ঃ ৮৬,৪৩০ (ছিয়াশি হাজার চারশত ত্রিশ)

২. অক্ষর সংখ্যা ঃ ৩২৩৭৬০

৩. পারার সংখ্যা ঃ ৩০

৪. মনজিল সংখ্যা ঃ ০৭

৫. সূরা সংখ্যা ঃ ১১৪

৬. রুকু সংখ্যা ঃ ৫৪০

১. তালিমুল কুরআন কায়েদা ঃ পৃ-৪৫ মাওঃ এ. কে. এম, শাহজাহান।

৭. আয়াত সংখ্যা ঃ ৬৬৬৬
৮. ফাতহা (যবর) সংখ্যা ঃ ৫৩২২৩
৯. কাসরা (যের) সংখ্যা ঃ ৩৯৫৮২
১০. দম্মা (পেশ) সংখ্যা ঃ ৮৮০৪
১১. মদ সংখ্যা ঃ ১৭৭১
১২. তাশদীদ সংখ্যা ঃ ১২৭৪
১৩. নুকতা সংখ্যা ঃ ১০৫৬৮৪

আয়াতের প্রকারভেদ ঃ

ওয়াদার আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
ওয়ায়ীদ (শাস্তির) আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
নিষেধের আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
নির্দেশের আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
দৃষ্টান্তের আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
কাহিনীর আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
হালালের আয়াত	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)
নিষিদ্ধের আয়াত	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)
তাসবীহের আয়াত	১০০ (একশত)
বিভিন্ন প্রকারের আয়াত	৬৬ (ছেষট্টি)
নাযিলের সময়কাল	২২ বছর ৫ মাস
ওহী লেখক সাহাবীর সংখ্যা	৪০ জন।

প্রথম ওহী ঃ اِقْرَاْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (৯৬ নং সূরা আলাক ১-৫নং আয়াত)

সর্বশেষ ওহী وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰه (২ নং সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত)

অথবা ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (৫নং সূরা মায়িদা ৩ নং আয়াত)

মনজিল এর বিভাগ ঃ

১ম মনজিল	সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসা
২য় ,, ,,	মায়িদা ,, ,, তাওবা
৩য় ,, ,,	ইউনুস ,, ,, নাহল
৪র্থ ,, ,,	বনী ইস্রাঈল ,, ফুরফান
৫ম ,, ,,	শুয়ারা ,, ইয়াসীন
৬ষ্ঠ ,, ,,	ছফফাত ,, হুজুরাত
৭ম ,, ,,	ক্বাফ ,, নাস

অক্ষর এর সংখ্যা ঃ

অক্ষরের উচ্চারণ	**কত বার ব্যবহৃত**
ا – আলিফ	৪৮৮৭৪ বার
ب – বা	১১৪২৮ বার
ت – তা	১১৯৯ বার
ث – ছা	১২৭৬ বার
ج – জীম	৩২৭৩ বার
ح – হা	৯৭৩ বার
خ – খা	২৪১৬ বার
د – দাল	৫৬০১ বার
ذ – যাল	৪৬৭৭ বার
ر – র	১১৭৯৩ বার
ز – যা	১৫৯০ বার
س – সীন	৫৯৯১ বার
ش – শীন	২১১৫ বার
ص – ছোয়াদ	২০১২ বার
ض – দ-দ	১৩০৭ বার
ط – ত্ব	১২৭৭ বার
ظ – জ	৮৪২ বার
ع – আইন	৯২২০ বার
غ – গাইন	২২০৮ বার

ف – ফা ৮৪৯৯ বার

ق – ক্বাফ ৬৮১৩ বার

ك – ক্বাফ ৯৫০০ বার

ل – লাম ৩৪৩২ বার

م – মীম ৩৬৫৩৫ বার

ن – নূন ৪০১৯০ বার

و – ওয়াও ২৫৫৩৬ বার

ه – হা ১৯০৭০ বার

لا – লাম আলিফ ৩৭২০ বার

ى – ইয়া ৪৫৯১৯ বার

তিলাওয়াতের সিজদা ঃ সকলে একমত ১৪ স্থানে সিজদা করতে হবে।

মতানৈক্য ১ স্থানে।

নিজ দৃষ্টিতে আল কুরআন ঃ আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদ ও ফুরকান হামীদ এর মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করেছেন। এ মর্যাদা বর্ণনা এক নজরে নিম্নে পেশ করা হলো। সূরা এবং আয়াত নং লিখে দেয়া হলো–

১. কুরআন মাজীদ আল্লাহ্ তায়ালার অবতারিত

২০ নং সূরার ৪ নং আয়াত

২০ নং সূরার ৮নং আয়াত

২৬ নং সূরার ১৯২ নং আয়াত

৩৩ নং সূরার ২ নং আয়াত

৪১ নং সূরার ২ নং আয়াত

৪১ নং সূরার ৪২ নং আয়াত

৫৬ নং সূরার ৮০ নং আয়াত

৬৯ নং সূরার ৪৩ নং আয়াত

২. কুরআন মাজীদ জিবরাঈল (আ) নিয়ে এসেছেন–

২৬ নং সূরার ১৯৩ নং আয়াত।

৩. কুরআন মাজীদ রাসূল ﷺ এর ওপর অতীর্ণ হয়।

১৫ নং সূরা হিজর এর ৬ নং আয়াত

২০ নং সূরা ত্বহার এর ২ নং আয়াত

৪৭ নং সূরা মুহাম্মাদ এর ২ নং আয়াত
২৬ নং সূরা শুআরা এর ১৯৪ নং আয়াত
৬৯ নং সূরা হাক্কাহ এর ৪০ নং আয়াত
৭৬ নং সূরা দাহর এর ২৩ নং আয়াত

৪. কুরআন নাযিলের মাস
২ নং সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াত

৫. কুরআন নাযিলের মাস বরকতময়
৯৭ নং সূরা ক্বদর এর ১ নং আয়াত
৪৪ নং সূরা দুখান এর ৩ নং আয়াত

৬. কুরআন মাজীদের ভাষা আরবি
২৬ নং সূরা শুআরা এর ১৯৫ নং আয়াত
৩৯ নং সূরা যুমার এর ২৮ নং আয়াত
৪২ নং সূরা শূরা এর ৭ নং আয়াত
৪৩ নং সূরা যুখরুফ এর ৩ নং আয়াত
৪৬ নং সূরা আহক্বাফ এর ১২ নং আয়াত

৭. কুরআনের ভাষা আরবি হওয়ার কারণ
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা এর ৪৪ নং আয়াত
৪৪ নং সূরা দুখান এর ৫৮ নং আয়াত
৪২ নং সূর শূরা এর ৭৭ নং আয়াত

৮. আল কুরআনে কি আছে?
১৪ নং সূরা ইবরাহীম এর ৫২ নং আয়াত

৯. কুরআন মাজীদ সন্দেহ-শুবাহের উর্ধ্বে
২ নং সূরা বাকারার ২ নং আয়াত

১০. কুরআন মাজীদ শোনার সময় চুপ থাকা।
৭ নং সূরা আরাফ এর ২০৪ নং আয়াত
৭৫ নং সূরা কিয়ামাহ এর ১৬ নং আয়াত
৪৬ নং সূরা আহক্বাফ এর ২৯ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদাহ এর ২৬ নং আয়াত

১১. কুরআন মাজীদের নাম

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদার ৪৪ নং আয়াত

৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়াহ এর ৭৭ নং আয়াত

৪৩ নং সূরা যুখরূফ এর ৩ নং আয়াত

১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৬০ নং আয়াত

৪২ নং সূরা শূরা এর ৭ নং আয়াত

৫৯ নং সূরা হাশর এর ২১ নং আয়াত

২৭ নং সূরা নামল এর ১ নং আয়াত

১৫ নং সূরা হিজর এর ১ নং আয়াত

২৫ নং সূরা ফুরকান এর ৩২ নং আয়াত

১২. কুরআনের গুণাবলী, রাসূলের গুণাবলী

১৬ নং সূরা নাহল এর ৮ নং আয়াত

১৩. কুরআনকে পবিত্র লোকে স্পর্শ করবে

৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়াহ এর ৭৯ নং আয়াত

১৪. আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জ

২ নং সূরা বাকারা এর ২৩ নং আয়াত

১০ নং সূরা ইউনুস এর ৩৮ নং আয়াত

১১ নং সূরা হুদ এর ১৩ নং আয়াত

১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৮৮ নং আয়াত

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদার ৪২ নং

৫২ নং সূরা তুর এর ৩৪ নং আয়াত

১৫. স্মরণ করার জন্য কুরআন সহজ

৫৪ নং সূরা ক্বামার এর ১৭ নং আয়াত

৫৪ নং সূরা ক্বামার এর ৪০ নং আয়াত

৪৪ নং সূরা দুখান এর ৫৮ নং আয়াত

১৬. কুরআন পাক ধীরে ধীরে পড়ার নির্দেশ

২০ নং সূরা ত্বোয়াহা এর ১১৪ নং আয়াত

৭৩ নং সূরা মুযযাম্মিল এর ৪ নং আয়াত

১৭. কুরআন মাজীদের বিপরীতে পিঠ করে বসা
৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামাহ এর ৩২ নং আয়াত

১৮. কুরআন মাজীদের অবমাননাকারীর শাস্তি
১৫ নং সূরা হিজর এর ৯১ নং আয়াত

১৯. আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের হিফাযতকারী
১৫ নং সূরা হিজর এর ৯ নং আয়াত
৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামাহ এর ১৬ নং আয়াত
৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামাহ এর ১৯ নং আয়াত

২০. পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে কুরআন মাজীদের উল্লেখ
২৬ নং সূরা শুয়ারা এর ১৯৬ নং আয়াত

২১. কুরআন মাজীদ এবং বয়স্কদের দিকে পিঠ দিয়ে না বসা
৮০ নং সূরা আবাসা এর ১৪ নং আয়াত
৮৮ নং সূরা গাশিয়াহ এর ২৩ নং আয়াত

২২. নবী কারীম ﷺ এর সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার কথাবার্তা
৬৯ নং সূরা হাক্কাহ এর ৪০ নং আয়াত

২৩. কুরআন মাজীদ উপদেশ
৭৩ নং সূরা মুযযাম্মিল এর ১৯ নং আয়াত
৮০ নং সূরা আবাসা এর ১২ নং আয়াত
৮০ নং সূরা আবাসা এর ১৬ নং আয়াত
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ১ নং আয়াত
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ৮৭ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা এর ৪১ নং আয়াত
৪৫ নং সূরা জাছিয়াহ এর ২০ নং আয়াত

২৪. কুরআন মাজীদ এবং আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে যারা নীচু দেখে তাদের শাস্তি
৩৪ নং সূরা সাবা এর ৩৮ নং আয়াত

২৫. কুরআন মাজীদ মুমিনদের জন্য হেদায়াত এবং সুখবর
১৬ নং সূরা নাহল এর ৬৪ নং আয়াত

২৭ নং সূরা নামল এর ২ নং আয়াত
২৭ নং সূরা নামল এর ৭৭ নং আয়াত
৩১ নং সূরা লুকমান এর ১ নং আয়াত
৩১ নং সূরা লুকমান এর ৫ নং আয়াত
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৮২ নং আয়াত
১০ নং সূরা ইউনুস এর ৫৭ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা এর ৪৪ নং আয়াত
৬ নং সূরা আনআম এর ১৫৭ নং আয়াত
৩৯ নং সূরা যুমার এর ৪১ নং আয়াত

২৬. কুরআনে বিজ্ঞান
৬ নং সূরা আনআম এর ৩৮ নং আয়াত
৬ নং সূরা আনআম এর ৫৯ নং আয়াত
৩৫ নং সূরা ফাতির এর ১১ নং আয়াত
১৬ নং সূরা নাহল এর ৮৯ নং আয়াত
১০ নং সূরা ইউনুস এর ৩৭ নং আয়াত
১০ নং সূরা ইউসুস এর ৬১ নং আয়াত
২৭ নং সূরা নামল এর ৭৫ নং আয়াত
৫৪ নং সূরা ক্বামার এর ৫ নং আয়াত
৩৪ নং সূরা সাবা এর ৩ নং আয়াত
১২ নং সূরা ইউসুফ এর ১১১ নং আয়াত
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ১২ নং আয়াত
২২ নং সূরা হজ্জ এর ৭০ নং আয়াত

২৭. কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ তায়ালার ইবাদত
৩৫ নং সূরা ফাতির এর ২৯ নং আয়াত

২৮. কুরআন মাজীদ শয়তান নিয়ে আসে নি
২৬ নং সূরা শুআরা এর ২১০ নং আয়াত

২৯. কুরআন মাজীদ বুঝে পড়া
৪ নং সূরা নিসা এর ৮২ নং আয়াত

৩ নং সূরা আলে ইমরান এর ১১৮ নং আয়াত
২ নং সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত
২ নং সূরা বাকারার ২৪২ নং আয়াত
২ নং সূরা বাকারার ২৬৬ নং আয়াত
৭ নং সূরা আরাফ এর ১৭৬ নং আয়াত
১০ নং ইউনুস এর ২৪ নং আয়াত
১৬ নং সূরা নাহল এর ৪৪ নং আয়াত
২৩ নং মুমিনূন এর ৬৮ নং আয়াত
২৪ নং সূরা নূর এর ১ নং আয়াত
২৯ নং সূরা আনকাবুত এর ৪৩ নং আয়াত
৩০ নং সূরা রূম এর ২৮ নং আয়াত
৪৭ নং সূরা মুহাম্মাদ এর ২৪ নং আয়াত
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ২৯ নং আয়াত
১২ নং সূরা ইউসুফ এর ২ নং আয়াত
৩৯ নং যুমার এর ২৮ নং আয়াত
৪৩ নং সূরা যুখরুফ এর ৩ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা এর ৩ নং আয়াত
৫৯ নং সূরা হাশর এর ২ নং আয়াত
৫৯ নং সূরা হাশর এর ২১ নং আয়াত।

৩০. আল্লাহ তায়ালা কুরআনের কসম খেয়েছেন
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ১ নং আয়াত

৩১. কুরআন মাজীদের পর কাফিরদের ঝগড়া
৪০ নং সূরা মুমিন এর ৪ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা এর ৪০ নং আয়াত

৩২. কুরআন মাজীদ অনেক কাফিরকে উন্নতি দেয়
৫ নং সূরা মায়িদা এর ৬৪ নং আয়াত
৫ নং সূরা মায়িদা এর ৬৮ নং আয়াত

৩৩. কুরআন মাজীদে প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ স্তরে স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে

১৮ নং সূরা কাহফ এর ৫৪ নং আয়াত
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৮৯ নং আয়াত
৩০ নং সূরা রূম এর ৫৮ নং আয়াত
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৪১ নং আয়াত

৩৪. কুরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরালে তার হিদায়াত বাতিল হয়ে যায়
১৮ নং সূরা কাহফে এর ৫৭ নং আয়াত
৪৫ নং সূরা জাসিয়াহ্ এর ২৩ নং আয়াত

৩৫. কুরআন মাজীদ সংযুক্ত ও ধারাবাহিক
২৮ নং সূরা কাসাস এর ৫১ নং আয়াত

৩৬. জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কুরআন মাজীদ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে থাকে
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ২৯ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদাহ এর ৩ নং আয়াত
৫০ নং সূরা ক্বাফ এর ৪৫ নং আয়াত
১৪ নং সূরা ইবরাহীম এর ৫২ নং আয়াত

৩৭. এই কুরআন উপদেশ, তোমরা কি তা অস্বীকার করতে চাও?
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ২৯ নং আয়াত
২১ নং সূরা আম্বিয়া এর ৫০ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা ৪১ নং আয়াত
৬ নং সূরা আনআম এর ৯২ নং আয়াত
৬ নং সূরা আনআম এর ১৫৫ নং আয়াত

৩৮. যদি কুরআন মাজীদ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত তাহলে এর ভিতরে অনেক বৈপরিত্য পাওয়া যেত।
৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াত

৩৯. কুরআন মাজীদ উত্তম কিতাব এর তিলাওয়াত আল্লাহর যিকর এর দিকে ধাবিত করে।
৩৯ নং সূরা যুমার এর ২৩ নং আয়াত

৪০. জ্বিনদের কুরআন মাজীদ শোনা
৪৬ নং সূরা আহকাফ এর ২৯ নং আয়াত
৭২ নং সূরা জ্বিন এর ১নং আয়াত

৪১. কাফিররাও কুরআন মাজীদ শুনতো, তাদের শোনার কারণ
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৪৭ নং আয়াত

৪২. কুরআন মাজীদ কাফিরদের হেদায়েত এর জন্য
৬ নং সূরা আনআম এর ১৪ নং আয়াত

৪৩. মিথ্যাকে জোর দেবার জন্য কুরআন পেশকারী জাহান্নামী
২২ নং সূরা হজ্জ এর ৫১ নং আয়াত

৪৪. যে কুরআন মাজীদ থেকে অন্ধ হয়ে থাকবে তার ওপর শয়তান কর্তৃত্ব করে
৪৩ নং সূরা যুখরূফ এর ৩৬ নং আয়াত

৪৫. কুরআন মাজীদ প্রথম থেকে লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল
৪৩ নং সূরা যুখরূফ এর ৪ নং আয়াত

৪৬. কুরআন মাজীদ সোজা রাস্তা
৬ নং সূরা মায়িদা এর ১২৬ নং আয়াত

৪৭. কুরআন মাজীদে হিকমতও আছে, বর্ণনাও আছে
১১ নং সূরা হুদ এর ১ নং আয়াত
৫৪ নং সূরা ক্বামার এর ৫ নং আয়াত

৪৮. সূরা ফাতিহা এবং কুরআন মাজীদের মর্যাদা
১৫ নং সূরা হিজর এর ৮৭ নং আয়াত

৪৯. কুরআন মাজীদ সত্যকে স্পষ্টকারী কিতাব
২৩ নং সূরা মুমিনূন এর ৬২ নং আয়াত

৫০. কুরআন মাজীদ লোকদের শিক্ষার জন্য
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ১০৬ নং আয়াত

৫১. পরবর্তী আসমানী কিতাবগুলোর পণ্ডিত আলেমগণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আল কুরআনের অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় স্বীকৃত ছিলেন
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ১০৭ নং আয়াত
২৬ নং সূরা শুআরা এর ১৯৬ নং আয়াত

৫২. জালিম কুরআন মাজীদ বুঝে না
১৮ নং সূরা কাহফ এর ৫৭ নং আয়াত

৫৩. কুরআন মাজীদে হুজুর পাক ﷺ-এর সাহাবীদের উল্লেখ আছে

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ২৪ নং আয়াত

৫৪. কুরআন মাজীদের মর্মার্থ হুজুর পাক ﷺ -এর দিলের ওপর নাযিল হয়েছিল

২৬ নং সূরা শুআরা এর ১৯৪ নং আয়াত

৫৫. ইবাদতকারীদের হেদায়াত লাভের জন্য কুরআন মাজীদই যথেষ্ট

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ১০৬ নং আয়াত

৫৬. আল্লাহ তায়ালা হুজুর পাক ﷺ কে কুরআন মাজীদ শিখিয়েছেন

২৭ নং সূরা নামল এর ৬ নং আয়াত

৫৫ নং সূরা আর রাহমান এর ২ নং আয়াত

কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্য

ইহুদী ধর্ম ঃ বর্তমানে আমাদের সামনে বাইবেল, ইঞ্জিল এবং বেদ এর কিছু কপি বর্তমান আছে, যেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। কুরআন মাজীদে যাবুর, তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে আসমানী কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং বাইবেলের ওল্ডটেস্টমেন্ট এর ৪২ খানা কিতাব আছে যার অনুসারীদের বিশ্বাস এই যে, এ সকল কিতাব হযরত ঈসা (আ) এর পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ পেয়েছিলেন। নিউ টেস্টামেন্টের ২৭ খানা কিতাব এর মধ্যে যা ঈসা (আ) এর যুগে ইলহাম হয়েছিল। এগুলো ঐ সকল কিতাব যার অধিকাংশের ব্যাপারে প্রথমে ঈসায়ী আলেমদের মধ্যেও সংশয় ছিল; কিন্তু ঈসায়ী চতুর্থ শতাব্দীতে নাইস এর থস এবং ফ্লারেন্স এ বসে খৃস্টীয় আলেমগণ পরামর্শ করে সন্দেহযুক্ত পুস্তকগুলো গ্রহণ করে নেন। (আসমানী ছহীফা পৃষ্ঠা নং- ১৪)

এ সকল একারণে অগ্রহণযোগ্য যে, এগুলোর গ্রহণকারী এবং নকলকারীদের আমাদের কোন পাত্তাই মিলে না, সে কি সত্যবাদী ছিল নাকি মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্ট ছিল নাকি সুপথ প্রাপ্ত, শক্তিশালী মুখস্থশক্তিসম্পন্ন নাকি ভুল-ভ্রান্তিপ্রবণ। অতঃপর যিনি পৌছে দিলেন তিনি নিজেই পৌছে দিলেন নাকি মিল-ঝিল করে পৌছালেন। যার সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ জাগে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। তাহলে কে নিজের বিশ্বাস, নিজের আমল বরং স্বয়ং নিজে নিজেকে এধরনের সনদহীন কিতাবের বরাত দিবে।

খৃস্টধর্ম ঃ খৃস্টধর্মের কেন্দ্রবিন্দু পবিত্র ইঞ্জিল এর ওপর। অতঃপর ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য কি? আপনি নিশ্চিত জানুন যে, বর্তমানে ইঞ্জিলগুলোও সনদ বিহীন। সহীহ মূল ইঞ্জিল পৃথিবী থেকে বিলীন হয়েছে। এর অনুবাদ আছে এবং তাও ইবারত (মূল) বিহীন এবং লুক এবং মার্কস থেকে যে ইঞ্জীলগুলো সম্পৃক্ত এর মূল বিষয় এই যে, এ দুই বুজুর্গ হযরত ঈসা (আ) এর যুগেও ছিলেন না। যে কারণে তৃতীয় শতাব্দীতে ইঞ্জিলগুলোর সত্যতা সম্পর্কে মতানৈক্য আরম্ভ হয়েছিল এবং খৃস্টীয় পণ্ডিতদের এক বড় দলের মানতে হয়েছিল যে, এ ধরনের সম্পৃক্ততা ভুলের ওপরে ছিল, অতঃপর বিদ্যমান ইঞ্জিলগুলোর শিক্ষা শিরক এবং কুফরীর সাথে জড়িয়ে গিয়েছে যা আসমানী প্রশিক্ষণের বিপরীত। অনেক বক্তব্য অশ্লীল এবং অনেক বক্তব্য আমলের অযোগ্য। এ জন্য এগুলো মূল ইঞ্জিল নয়। ইদানীং আমেরিকায় এক

কমিটি বসেন, যারা ফায়সালা করেন যে, প্রত্যেক বছর ইঞ্জিলগুলোর যে তাজা সংস্করণ বের হয়ে আসছে, এগুলোর সাথে ইঞ্জিলের সত্যতা আরো বেশি সংমিশ্রণ হচ্ছে। এজন্য বর্তমানে আর অধিক সংস্করণের প্রয়োজন নেই এবং বর্তমানে নতুন সংস্করণ বের করা যাবে না।

একটা ইঞ্জিল যাকে হওয়ারী বার্ণাবাসের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, যা বাবায়ে রোম লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত, যেহেতু উহা খৃষ্টীয় পণ্ডিতদের বহু অপারেশন থেকে কোন প্রকারে বেঁচে রয়েছে, এ জন্য এর বিষয়াবলী বেশির ভাগ কুরআনের সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু বর্তমানে তাও মূল হিসেবে নেই। ইঞ্জিলগুলোর বর্তমান বিশ্বাসগুলো বর্ণনা করা হলে মানবতা লজ্জিত হয়ে পড়বে।

সনাতন ধর্ম ঃ সনাতন ধর্ম অর্থ হিন্দু মতবাদ। এদের 'বেদ' এর পুস্তকগুলোর একটা অংশও আসমানী নয়। কেননা এর নিজেরই আসমানী কিতাব হবার ব্যাপারে কোন দাবি নেই। তাঁর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তিও পাওয়া যায় না। কিছু হিন্দু পণ্ডিত বলেন যে, এগুলো ভিয়াজ জীর বিন্যাসকৃত যিনি জরুথস্ট এর যুগে ছিলেন এবং বলখ গিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ লিখেন, 'ইহা কোন ব্রাহ্মণের তৈরি।' প্রফেসর পণ্ডিত কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য কোলকাতা কলেজ, ভারতে সংস্কৃত এর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ঋগ্বেদের অংশগুলো এদেশের কবি এবং ঋষিগণ লিখেছেন এবং তা বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। অতঃপর উঁচু-নীচু, জাত পাত, অধিক খোদা, এ সকল ঐ বক্তব্য যা জ্ঞান এবং মানবতা উভয়দিক দিয়েই অসংলগ্ন। কখনো এই একক খোদা রব্বুল আলামীন এর শিক্ষা ছিল না। এর মধ্যে কিছু এমন লজ্জাহীন বক্তব্য বরং শিক্ষা পাওয়া যায়, যাকে কলম প্রকাশ করতে অপারগ। এসকল কারণে একথা মানতেই হয় যে, এগুলো কখনোই আসমানী কিতাব নয়।

'মহাভারতে বেদগুলোর বিধানাবলী একে অপরের বিপরীত, এরূপভাবে স্মৃতি (বেদ) এর বিধানগুলোও। এমন কোন ঋষি নাই যার শিক্ষা অন্য ঋষির বৈপরীত্য করে না।' (হিন্দু মতবাদ, পৃ- ৬২)

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন কবিগণ, নিজ পরিবেশে, সমাজ, সংস্কৃতি, রসম ও বর্ণনা, কিসসা-কাহিনী অনুযায়ী যে সকল কবিতা গেয়েছেন, সেগুলো আর্যদের ভোগ বিলাসী জীবন-যাপন এবং পরবর্তীতে কান্তকারীর যুগে মুখরোচক সৃষ্টি ছিল। পরবর্তীতে ভিয়াস জী এর মধ্যে নিজ আচরণ ও চিন্তা-ভাবনা যোগ করেন এবং লিখে নেন। এটাও সম্ভব যে, বেদ এর কোথাও কোথাও ঐশ্বরিক শিক্ষাও রয়েছে। কেননা

এগুলোর মধ্যে অংশীবাদী শিক্ষার সাথে সাথে কোথাও কোথাও ঐশ্বরিক শিক্ষার ঝলকও দেখা যায়।

মিতাপুরা হিন্দুত্ববাদের ৯০ নং পৃষ্ঠার বরাতে লিখেন– এক বেদ এর ওপর অনেকবার পরিবর্তন ঘটেছে। ঋষিধের পরবর্তীরা এর ওপর খারাপ দৃষ্টি আরো কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে অনেক বিপরীতধর্মী জিনিস প্রবেশ করায়। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং কালপ মতদের হস্তক্ষেপে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ঋগ, যযুর এবং সাম বেদের বারবার সংকলন হয়েছে। প্রথমে যযুর্বেদ একই ছিল, এরপর দুই অংশ হয়ে গেল। এভাবে দুয়াপরা যুগে তিন বেদের মধ্যেই হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

ফ্রান্সের পণ্ডিত ডাঃ লিবইয়ান লিখেন- 'এই হাজার হাজার খণ্ডের মধ্যে যা হিন্দুগণ তিন হাজার বছরের ঐতিহ্যের মধ্যে লিখেছেন যা এক ঐতিহাসিক ঘটনা, সত্যের সাথে যা সমতা রক্ষা করতে সক্ষম নয়। এ সময়ের মধ্যে কোন ঘটনাকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা সম্পূর্ণ সাহারায় হাবুডুবু খাচ্ছি। এ ধরনের ঐতিহাসিক পুস্তক এর মধ্যে এ ধরনের আশ্চর্য ও অপরিচিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসকে ভুল এবং অপ্রাকৃতিক আকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের পাওয়া যায় এবং মানুষকে এ ইচ্ছার ওপর জবরদস্তি করে যে তার মেধা অকেজো। অতীত হিন্দুদের কোন ইতিহাসই নাই এবং দালান এবং স্মৃতিসৌধেরও কোন সন্ধান নাই। ... ভারতের ঐতিহাসিক যুগ বাস্তবে মুসলমানদের সেনা শাসনের পর শুরু হয় এবং হিন্দুস্তানের প্রথম ঐতিহাসিক মুসলমানই। হিন্দুদের সম্মানিত পুস্তক বেদ যার সংখ্যা হল চার–

১. ঋগ্বেদ

২. সামবেদ

৩. যযুর্বেদ

৪. অথর্ববেদ

বেদকে স্মৃতিও বলা হয়, যার উদ্দেশ্য হলো শোনা শোনা বক্তব্য। এতে দু'হাজার বছর পর বিশাল নড়াচড়া হয়। সবচে' পুরাতন হলো ঋগ্বেদ। এ থেকে অন্যান্য বেদ বানানো হয়েছে। এক সময় এমনও হয়েছিল যে, ঋগ্বেদ ধ্বংস হয়েছিল। এই বেদ ব্রাহ্মণদের একজন থেকে অন্য জনের সীনায় বর্ণনাকারে স্থানান্তর হচ্ছিল। (তামাদ্দুনে হিন্দ ১৪৪ পৃঃ থেকে ১৪৭ পৃঃ)

যদিও হিন্দু মতবাদের ব্যাপারে অনেক কিছু লেখা যাবে। কিন্তু যখন আমরা এ ধর্মের শিক্ষা এবং হিন্দুদের প্রাত্যহিক পূজা অর্চনার দিকে দৃষ্টি দেই, তাহলে তাওহীদের স্থলে আমাদের কুফরী ও শিরক, মূর্তিপূজা, শক্তিপূজা ছাড়া আর কিছু

নজরে আসে না। হিন্দুদের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ কোটি। হিন্দুগণ জমীনের সকল প্রাণী-অপ্রাণীকে দেবতা বানিয়েছে। যদি সৃষ্টির সকল মুক্তা ও তারকাকে দেবতা নির্ধারণ করি, তাহলে ৩৩ কোটি কেন অসংখ্য দেবতা বানানোর দরকার হবে।

বেদগুলোর সামাগ্রিক শিক্ষা নিম্নরূপ ঃ

১. বেদের শিক্ষা মানুষের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষকে অবমাননা, কমশক্তি এবং নীচু জাতওয়ালাকে ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়।

২. বেদগুলো বিভেদ প্রচার করে, লুট-পাট এবং প্রতারণার উঁচু জাতগুলোর জন্য বৈধ করে দেয়, এবং উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করে অসম আচরণের নির্দেশ দেয়।

৩. বেদ পূজার ক্ষেত্রে- মূর্তিপূজা, কুফর, শিরক এর শিক্ষা দেয়, যা মারাত্মক প্রকারের গুনাহ।

৪. বেদগুলোর শিক্ষা মানব মস্তিষ্কপ্রসূত, যার ক্ষুদ্র অংশেও অণুপরিমাণ আল্লাহর শিক্ষার সাথে সম্পর্ক নেই।

৫. বেদগুলোতে ব্রাহ্মণদের জন্য অন্যায়ের সীমা পর্যন্ত অধিকার দিয়েছে, যে কাজ অন্যদের জন্য অপরাধ তা ব্রাহ্মণদের জন্য বৈধ। অব্রাহ্মণদের অধিকারকে শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তাদের হক নষ্ট করা হয়েছে।

৬. বেদ স্বয়ং শক্ত দেবতা, তারকা, আগুন, পানি, বাতাস এবং মাটির পূজা করার অনুমতি দেয়।

৭. বেদগুলোতে মানুষকে খোদার মর্যাদা দিয়েছে।

৮. বেদগুলোতে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা দেবতাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁদের নিষিদ্ধ যৌনাচারের বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে, যা তাঁদেরকে সাধারণ ভাল লোকদেরও নীচু স্তরে নামিয়ে প্রকাশ করে। এ আকারে নিকৃষ্টভাবে তাদের বেইজ্জতী করা হয়েছে।

৯. বেদগুলোতে লজ্জাস্থানের পূজা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত আদিম মূর্তিপূজক জাতিগুলোর মধ্যেও দেখা যায় না।

১০. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত; কিন্তু বেদগুলোতে সৃষ্টিকূলের সৃষ্টির ক্ষেত্রে অযৌক্তিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বরং দেবতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১১. দেবতাদের সকল মাখলুকের মত ধারণা করা হয়েছে, তাদের স্ত্রীও রয়েছে যাদের নাম শ্রীদেবী, কালী; কালকাতা, ওয়ালী এবং লক্ষ্মী দেবী।

১২. বেদগুলোর মধ্যে নারীদের নিকৃষ্টরূপে অপমানিত করা হয়েছে, তাদের বৈধ হক দেয়া হয় নি।

১৩. বেদগুলোতে ব্রাহ্মণদের দেবতার মতো করেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণ জী, কৃষ্ণ লীলা, হনুমান জী ইত্যাদি।

১৪. আখেরাতের ধারণাও অপ্রকৃত, বিশ্বাসের অযোগ্য।

১৫. বেদ পড়ে এও জানা যায় যে, এর অনুসারীদের জন্য বিয়ের রীতি রহিত, এ লোক মায়ের পরিচয়মুক্ত। এ লোক জৈবিক প্রশান্তির জন্য অশ্লীলতার সুযোগ নিত। এ লোক জৈবিক প্রশান্তির জন্য নিজ মা, বোন, কন্যার সাথেও যৌন সম্পর্ক রাখত। বেদের শিক্ষার মধ্যে আজও ঐ সকল প্রভাব বাকী আছে। প্রচলিত আছে যে, রাজা দাহির নিজ বোনকে বিয়ে করেছিল। ধর্মের নামে আজও এ লোকগুলো জৈবিক অসততার শিকার।

১৬. বেদের অনুসারী লোকেরা মন্দিরের মধ্যে যৌনকর্ম করাকে বড় পূজা মনে করত। যদিও পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাবেল ও নিনওয়াই সংস্কৃতিতে মন্দিরগুলোতে এমন পণ্ডিত ছিল এবং শাম প্রধান, যুবকদের মন্দিরমুখী করে নিতেন। এ সময়ে দেবদাসী (যুবতী স্ত্রীলোক) দের মগজে এ ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হতো যে, পুরুষদের সাথে যৌন লীলা অনেক বড় পূজা এবং পুণ্যের কাজ। এ ধরনের বর্ণনা মন্দিরগুলোতে আজও দেখা যায়। এ পর্যায়ে অশ্লীলতার যাবতীয় আকৃতি মওজুদ ছিল।

ব্যস, প্রমাণিত হলো যে, আজ ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে কুরআন মাজীদ ব্যতীত এমন কোন ধর্মীয় পুস্তক নেই যা আল্লাহর অবতারিত এবং তার মূল অবস্থায় নিরাপদে রয়েছে। কুরআন মাজীদের প্রত্যেকটি হরফ, প্রত্যেকটি নুকতা এবং হরকত সংরক্ষিত, যার শিক্ষা একজন মৃত পণ্ডিত/আলেমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করে, যা আজও জীবিত আছে এবং কোটি কোটি বুকের মধ্যে সংরক্ষিত আছে, এবং যার শিক্ষার দিকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইউরোপ, আমেরিকাসহ দুনিয়ার সকল জাতি ধীরে ধীরে আসছে।

শক্ত এবং অনস্বীকার্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে যারা পৃথিবী বাস্তবমুখিতা, ধর্মহীনতার সন্দেহ, বেদ্বীনী ও পথহীনতার মারাত্মক অবস্থায় পৌছায়, যার কারণে পৃথিবী এমন এক হেদায়েতের অপেক্ষায় ছিল, যা সন্দেহমুক্ত এবং এমন এক পথ প্রদর্শকের জন্য অস্থির ছিল, যিনি সারা পৃথিবীবাসীর

জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হবেন। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর ওপর দয়া পরবশ হলেন এবং তাদের প্রতি রহমতের নবী মুহাম্মাদ ﷺ কে প্রেরণ করেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় বাণী কুরআন মাজীদ দান করেন, যার দ্বারা সারা পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে অমুসলিম পণ্ডিতদের সাক্ষ্য

১.খৃস্টীয় এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ ঃ এ সকল বক্তব্য ঐ সকল লোকদের জন্য যাদের নিকট কোন বক্তব্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তা ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিতদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সম্পৃক্ত না হয়। যাহোক এ সকল বক্তব্য ذكرى مصر (যিকরা মিসর) প্রথম খণ্ডের ৩২৭- থেকে ৩৩৩ পৃঃ থেকে নেয়া হয়েছে।

ক্যাম্ব্রীজ ইনসাইক্লোপেডিয়া ঃ 'কুরআন জুলুম, মিথ্যা, ধোঁকা, শাস্তি, গীবত, লোভ, অতিরিক্ত খরচ, হারাম কাজ, খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা এবং কুধারণাকে খুবই বড় অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং এটাই তাঁর বড় সৌন্দর্য।'

ডঃ গুস্তাভলিবান ফ্রান্সিসী ঃ 'কুরআন হৃদয়ের মধ্যে এমন জীবন্ত এবং শক্তিশালী বিশ্বাসের জোশ সৃষ্টি করে যে, এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।'

স্যার উইলিয়াম ম্যুর ঃ 'কুরআন প্রকৃতি ও সৃষ্টিকুলের প্রমাণাদির দ্বারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মানবমণ্ডলীকে আল্লাহর আনুগত্য এবং শোকর গুজারীর দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।'

প্রফেসর এডওয়ার্ড জী-ব্রাউন, এম, এ ঃ 'যখনই কুরআনের ওপর চিন্তা করি এবং এর বুঝ ও অর্থ বুঝার চেষ্টা করি, আমার হৃদয়ে এর মর্যাদা ও আসন বেড়ে যায়। কিন্তু জিন্দাবেস্তা (যা প্রফেসর সাহেবের ধর্মীয় পুস্তক) এর অধ্যয়নে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে, সময় জ্ঞান অথবা ভাষা বিশ্লেষণ অথবা এ ধরনর কোন উদ্দেশ্যে পড়লে তবীয়তের (স্বভাব/প্রকৃতির) মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে এবং সমস্যার সৃষ্টি করে।'

মিস্টার ইমানুয়েল ডি ইন্‌শ ঃ 'কুরআনের আলো ইউরোপে ঐ সময় পর্যন্ত পড়তে থাকে যতক্ষণ তারিকী মহাসাগর থাকে এবং এর দ্বারা গ্রীকের মৃত বিবেক ও জ্ঞান জীবিত হয়।'

ডঃ জনসন ঃ 'কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্যাবলী এমন উপযোগী ও সাধারণের বোধগম্য যে, পৃথিবী সেগুলোকে সহজেই গ্রহণ করে, আমাদের চিন্তা-ভাবনার ওপর আফসোস যে, আমাদের দেখে দেখে দুনিয়া এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।'

প্রফেসর রলিণ্ডাএ নিকোলসন ঃ 'কুরআনের প্রভাবে আরবি ভাষা সারা ইসলামী দুনিয়ার মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং কুরআন মেয়েদের জীবন্ত পুঁতে ফেলার পদ্ধতিকে শেষ করে দিয়েছে।'

মিস্টার এইচ, এস, লিডার ঃ 'কুরআনের শিক্ষায় দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রকাশ ঘটে এবং এতদূর পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে যে, নিজ যুগের ইউরোপীয় বড় বড় রাজ্যের শিক্ষাও বিজ্ঞান থেকে বেড়ে যায়।'

মিস্টার আই, ডি, মারীল ঃ 'ইসলামের শক্তি-সামর্থ্য কুরআনের মধ্যেই, কুরআন হলো মৌলিক জ্ঞান ও অধিকারের রক্ষক।'

জ্যাঁ জ্যাক রুশো, জার্মানী দার্শনিক ঃ 'যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে কোন বিধর্মী কুরআন শুনতেন, তখন ব্যাকুল হয়ে সিজদায় পড়ে যেতেন এবং মুসলমান হয়ে যেতেন।'

থিওডোর নোলডীকী ঃ 'কুরআন লোকদের আগ্রহ ও প্রশিক্ষণের দ্বারা বাতিল উপাস্যদের দিক থেকে ফিরিয়ে এক খোদার ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়। কুরআন মাজীদের মধ্যে বর্তমান এবং আগামীর নাম, জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।'

মিস্টার স্ট্যানলী লেইনপুল ঃ 'কুরআনে সকল কিছু আছে, যা একটি বড় ধর্মে থাকা উচিত এবং যা একজন বুজুর্গ লোক (মুহাম্মাদ) এর মধ্যে ছিল।'

মিস্টার জে, টি, বুটানী ঃ 'কুরআন অসীম ও অসংখ্য লোকদের বিশ্বাস এবং চাল-চলনের ওপর প্রকৃত প্রভাব ফেলেছে এবং বৈজ্ঞানিক পৃথিবী কুরআনের প্রয়োজনকে আরো প্রকাশ করে দিয়েছে।'

এইচ, জি, ওয়েলস ঃ 'কুরআন মুসলমানদের এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, যা বংশ এবং ভাষার পার্থক্যের অনুসরণ করে না।'

পাদরী ওয়ালারশন ডি, ডি, ঃ 'কুরআনের ধর্ম, নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম।'

মিস্টার বসুরথ ইসমথ ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাবি এই যে, কুরআন তার স্বাধীন এবং স্থায়ী মুজিযা এবং আমি স্বীকার করি যে, বাস্তবে ইহা এক মুজিযা।'

গড ফ্রি হেঙ্গিস ঃ 'কুরআন অপরিচিত লোকের বন্ধু ও দুঃচিন্তা দূরকারী, বয়স্ক লোকদের ওপর অবিচার সকল ক্ষেত্রে অবদমন করেছে।'

মিস্টার রিচার্ডসন ঃ 'গোলামীর অপছন্দনীয় নিয়ম দূর করার জন্য হিন্দু শাস্ত্রকে কুরআন দ্বারা পরিবর্তন করা দরকার (অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মীয় কিতাবগুলো যেমন

বেদের স্থানে যদি কুরআন মাজীদের শিক্ষা দেয়া যায় তাহলে গোলামী শেষ হয়ে যেত।')

ডীম স্টেনলী ঃ 'কুরআনের শিক্ষা উত্তম এবং মানুষের মগজের ওপর দাগ কেটে যায়।'

মেজর লিউনার্ড ঃ 'কুরআনের শিক্ষা সর্বোত্তম এবং মানব সমাজে অংকিত হয়ে যায়।'

আখবার নীরায়েস্ট ঃ 'যদি আমরা কুরআনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা এবং সৌন্দর্য ও সুগন্ধিকে অস্বীকার করি তাহলে আমরা জ্ঞান ও বিবেকশূন্য হয়ে যাব।'

স্যার এডওয়ার্ড ডেনিসন রস সি, আই, এ, ঃ 'কুরআন মজীদ এ কথার উপযুক্ত যে, ইউরোপের প্রতি প্রান্তে মধ্যে পড়া হবে।'

ডঃ চার্টেন ঃ 'কুরআনের আলোড়ন হৃদয়গ্রাহী, সংক্ষিপ্ত এবং অল্প কথায় অনেক বুঝায় এবং ইহা আল্লাহর স্মরণ ক্ষুরধার পদ্ধতিতে করে।'

মিস্টার আরনল্ড ভিহারেট ঃ 'কুরআন মুসলমানদের যুদ্ধপদ্ধতি শিখার সহমর্মিতা, কল্যাণ ও সমবেদনা। কুরআন ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম পেশ করে যা বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে রোধ করে না।'

ডাক্তার মরিস ফ্রান্সিসী ঃ 'কুরআনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার বাগ্মীতা ও সুস্পষ্টতা। উদ্দেশ্যের সৌন্দর্য ও লক্ষ্যের সুন্দর পদ্ধতির দিক দিয়ে কুরআনকে সকল আসমানী কিতাবের ওপর মর্যাদা দিতে হয়।'

মিস্টার লুডলফ কারমাল 'কুরআনে বিশ্বাস ও চরিত্রের পরিপূর্ণ বন্ধন ও বিধান বর্তমান। প্রশস্ত গণতন্ত্র সঠিক পথ ও হিদায়াত, ন্যায় ও আদালত, প্রশিক্ষণ এবং অর্থ, দরিদ্রদের সাহায্য এবং উন্নতির সর্বোচ্চ পদ্ধতি মওজুদ আছে এবং এ সকল বক্তব্যের ভিত্তি বারী তায়ালা সত্তার ওপর বিশ্বাসের।'

জর্জ সেল ঃ 'কুরআন কারীম নিঃসন্দেহে আরবি ভাষার সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে বির্ভরযোগ্য কিতাব। কোন মানুষ এমন অলৌকিকগ্রন্থ লিখতে পারেন না এবং এটা মৃতকে জীবিত করার চাইতেও বড় অলৌকিক।'

রিওনার্ড জি, এম, রডওয়েল ঃ 'কুরআনের শিক্ষায় মূর্তিপূজা দূর করে, স্বর্গ এবং পৃথিবীর শিরক দূর করে, আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা করে, সন্তান হত্যা করার কুপ্রথা চিরতরে বন্ধ করে।'

আর্যু রন্ড মাক্সওয়েল কং ঃ 'কুরআন ঐশী বাণীর সমষ্টি। এতে ইসলামের নিয়মাবলী, বিধান এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণ এবং দৈনন্দিন কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত নির্দেশনা রয়েছে এ দিক দিয়ে খৃস্টবাদের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এর ধর্মীয় শিক্ষা এবং (রাষ্ট্রীয়) বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।'

মসিয়ে ডাগিন ক্ল্যাফিল ফ্রান্সি ঃ 'কুরআন শুধু ধর্মীয় নীতিমালা এবং (রাষ্ট্রীয়) বিধানের সমষ্টিই নয়, বরং এর মধ্যে সামাজিক বিধানও রয়েছে যা মানবজীবনের জন্য সার্বক্ষণিক উপকারী।'

ডায়োন পোর্ট ঃ 'কুরআন মুসলমানদের সামগ্রিক বিধান। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ব্যবসায়িক, সামরিক, বিচারিক এবং ফৌজদারী সকল আচরণ এর মধ্যে রয়েছে। এ সত্ত্বেও এটি একটি ধর্মীয় পুস্তক। ইহা সকল জিনিসকে সুশৃঙ্খল বানিয়েছে।'

প্রফেসর কার্লাইল ঃ 'আমার দৃষ্টিতে কুরআনে সর্ব প্রথম থেকেই নিষ্ঠা ও সততা রয়েছে এবং সত্য তো ইহাই যে, যদি কোন ভাল জিনিস সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এ থেকেই হয়েছে।'

কোন্ট হেজরী তিকাসরী ঃ 'কুরআন দেখে হতবুদ্ধি হতে হয় যে, এধরনের বক্তব্য এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে কীভাবে নিঃসৃত হলো যিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন।'

ডক্টর গীবন ঃ 'কুরআন একত্ববাদের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। একত্ববাদী কোন দার্শনিকের যদি কোন ধর্ম গ্রহণ করতে হয় তাহলে তা হলো ইসলাম। যারা পৃথিবীতে কুরআনের উপমা মিলবে না।'

আলকেস লাওয়াঝু ফ্রান্সি দার্শনিক ঃ 'কুরআন আলো এবং বিজ্ঞানময় কিতাব। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, উহা এমন এক ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হয়, যিনি সত্য নবী ছিলেন এবং আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছিলেন। নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে এমন বিষয়াবলী যাদের সমাধান আমরা জ্ঞানের (বিজ্ঞানের) জোরে করেছি, এসকল বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কোন কথা নেই যা কুরআনী বিশ্লেষণের পরিপন্থী। আমরা খৃস্টানগণ, খৃস্টবাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর বানানোর জন্য আমরা এ পর্যন্ত যতখানি অগ্রসর হয়েছি ইসলাম এবং কুরআনে এগুলো পূর্ব থেকেই আছে এবং পূর্ণভাবেই আছে।

মসিয়ো সিড ফ্রান্সী ঃ 'ইসলামকে যে লোক পাশবিক ধর্ম বলে, সে কুরআনের শিক্ষা দেখে নি, যার প্রভাবে আরবিদের খারাপ এবং দুষ্ট অভ্যাসগুলোর আকৃতি পাল্টে গিয়েছিল।'

মসিয়ো কাস্টন কার ঃ 'পৃথিবী থেকে যদি কুরআনের হুকুমত চলে যায়, তাহলে পৃথিবীর নিরাপত্তা কখনোই টিকে থাকবে না।'

একিম ডি, বুলফ জার্মান ঃ 'কুরআন পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা এবং পাক বিষয়ে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি তার ওপর আমল করা যায়, তবে রোগের জীবাণু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

মিস্টার রুডুল ঃ 'যতই আমি এ কিতাবকে উলট-পালট করে দেখি, এই পরিমাণ প্রথম অধ্যয়নে অনাকাঙ্ক্ষিত নতুন নতুন রঙে রঞ্জিত হই। কিন্তু হঠাৎ আমাকে ধাঁধায় ফেলে দেয়, হয়রান করে দেয়, সর্বশেষ আমাকে সম্মান করতে বাধ্য করে। এর বর্ণনা পদ্ধতি, এর বিষয়াবলী ও উদ্দেশ্যের পবিত্রতা, বিরাট মর্যাদা ও ভয়ানক। এর উদ্দেশ্য চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। উদ্দেশ্য: এই কিতাব প্রত্যেক যুগে প্রত্যেকের ওপর জোর প্রভাব দেখায়।'

গ্যেটে ঃ 'আমি এই কিতাবের যতই নিকটবর্তী হই অর্থাৎ এর ওপর বেশি বেশি চিন্তা-ভাবনা করি তা এত পরিমাণ দরুর খেন্তি যায় অর্থাৎ, খুব উঁচু মনে হয়, উহা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে, অতঃপর আশ্চর্য করে দেয়, খুশির আমেজের আন্দোলনও দেয়, সর্বশেষ তাঁকে সম্মান করিয়ে ছাড়ে, এভাবে এ কিতাব সকল দৃষ্টিতে সম্মান করিয়ে ছাড়ে, এভাবে এ কিতাব সকল দৃষ্টিতে সর্বদা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে।'

পপুলার ইনসাইক্লোপেডিয়া ঃ 'কুরআনের ভাষা আরবি, খুবই স্পষ্ট উঁচুমানের, এর রচনার সৌন্দর্য একে আজ পর্যন্ত দৃষ্টান্ত ও উপমাহীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছাড়াও এর বিধানগুলো এ পরিমাণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী যে, যদি মানুষ তাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে, তবে সে এক পবিত্র জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়ে যায়।'

২. হিন্দু পণ্ডিতগণ

কুরআন মাজীদের ব্যাপারে আজ অজ্ঞ ভারতীয় এবং মূর্খ হিন্দু মাঝে মাঝেই কু ভাষা ব্যবহার করেছে। এখানে কিছু হিন্দু পণ্ডিতগণের বক্তব্য পেশ করা হলো, যাতে বুঝা যায় যে, স্বয়ং তাদের গোত্রের লোকরা কুরআন মাজীদের মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এডমন্ড বারক ঃ 'ইসলামী বিধান (কুরআন মাজীদ) বাদশাহ থেকে নীচু প্রকারের একটি রাখালেরও সাহায্যকারী। ইহা এমন এক বিধান যা এক জ্ঞান সীমার আওতায় বিজ্ঞ আইনের ওপর ব্যাপ্ত। যার দৃষ্টান্ত সারা দুনিয়ায় আর নেই।'

বাবা নানক (গুরু নানক) ঃ

توراتزبور انجیل اور وید وغیرہ سب کو پڑھ کر دیکھ لیا قران ھی قابل قبول اور اطمینان قلب کی کتاب نظرائی۔ اگر سچ پوچھو تو ا سچی اور ایمان کی کتاب جسی کی تلاوت سے دل باغ باغ ھو جاتا ہے وہ قران شریف ھی ھے۔

অর্থাৎ 'তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং বেদ ইত্যাদি সবগুলোকে পড়ে দেখলাম কুরআনই হলো গ্রহণযোগ্য এবং হৃদয়ের প্রশান্তিদায়ক কিতাব যা আমার নজরে এলো। যদি সত্য চাও তাহলে সত্য এবং ঈমানের কিতাব যার তিলাওয়াতের দ্বারা হৃদয় বাগ বাগ (আনন্দ ভরপুর) হয়ে যায়, উহা কুরআন শরীফই।'

বাবা ভুপেন্দ্রনাথ বসু ঃ 'তেরশত বছর পরে (এ কথা বাবা ভুপেন্দ্র আজ থেকে দেড়শত বছর পূর্বে লিখেছেন।) এ কুরআনের শিক্ষার এই প্রভাব বর্তমান আছে যে, এক দীনহীন মুসলমান হবার পর বড় বড় বংশীয় মুসলমানদের সমতা দাবি করতে পারে।'

বাবু বিপেন চন্দ্র পাল ঃ 'কুরআনের শিক্ষার মধ্যে হিন্দুদের মত জাত পাতের পার্থক্য নেই, কাউকে শুধু বংশমর্যাদা এবং সম্পদশালীর ভিত্তির ওপর বড়ও মনে করা হয় না।'

মিসেস সরোজিনী নাইডু ঃ 'কুরআন কারীম অমুসলমানদের থেকে অগোঁড়ামী এবং উদারতা শিক্ষা দেয়, দুনিয়া এর অনুসরণের দ্বারা ভাল অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।'

মহাত্মাগান্ধী ঃ 'কুরআনকে ঐশী কিতাব মেনে নিতে আমার মধ্যে অণুপরিমাণ চিন্তার প্রয়োজন নেই।'

চাঁদ এবং কুরআন

প্রকৃতির প্রকাশ ঃ চাঁদ মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকুলের অগণিত প্রকৃতির মধ্যে থেকে একটি। মানুষ সর্বদা প্রকৃতি সম্বন্ধে জানার জন্য উদগ্রীব রয়েছে। আসমানের দিকে দৃষ্টি বুলায়, সে অগণিত তারকা, গ্রহ, সূর্য, চাঁদ দেখে চিন্তা করে এদের সৃষ্টি কীভাবে হলো? এই শক্তিশালী এবং সুন্দর ব্যবস্থাপনার মূল কোথায়? এই সুন্দর প্রকৃতির প্রকাশ এর সৃষ্টির সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়া কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এসকল নির্দশন এবং বাস্তবতার ওপর চিন্তা করার আহ্বান জানায়।

চাঁদ এবং কুরআন মাজীদ ঃ বহু কুরআনের আয়াত এ সকল প্রকৃতির প্রকাশের রহস্যের পর্দা উঠিয়ে থাকে। ৩১ নং সূরা লুকমানের ২৯ নম্বর আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِىْ النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِىْ الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ـ

'তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তায়ালা রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য এবং চাঁদকে চালান, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।'

সূরা নূহ এর ১৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ـ

'এবং আল্লাহ চাঁদকে জ্যোতি বানিয়েছেন এবং সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল চেরাগের মত।'

চাঁদের চলমানতা সম্পর্কে আল কুরআনের ১০ নং সূরা ইউনুসের ৫ নং আয়াতে তিনি বর্ণনা করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ـ مَاخَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ ـ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ

'সে মহান সত্তা (আল্লাহ) সূর্যকে প্রখর তেজোদীপ্ত করে বানিয়েছেন এবং চাঁদকে বানিয়েছেন জ্যোতির্ময়। অতঃপর আকাশে তার জন্যে কিছু মনযিল তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে এ নিয়ম দ্বারা তোমরা বছর গণনা এবং (দিন তারিখের) হিসাবটা জানতে পার। আল্লাহ তায়ালা যেসব জিনিস পয়দা করে রেখেছেন তার কোনটাই তিনি অনর্থক করেন নি'। যারা এ সম্পর্কে জানতে চায় তাঁদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তার নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন।'

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ـ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

'আল্লাহ তায়ালাই রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রত্যেকেই মহাকাশের কক্ষ পথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।'

১৪ নং সূরা ইবরাহীমের ৩৩ নং আয়াতে ....

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ـ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ـ

'তিনি চন্দ্র-সূর্যকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, উভয়ে (একই নিয়মে) চলে আসছে, আবার রাত দিনকেও তোমাদের অধীন করেছেন।'

৫৫ নং সূরা আর রাহমানের ৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন– اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 'সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নির্ধারিত হিসাব মোতাবেক চলছে।'

চাঁদ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ঃ সকল খোলা দেহের মধ্যে সবচে' নিকটবর্তী মানুষের নিকট পরিচিত একটি পুরাতন আকৃতি হলো চাঁদ। অতীত কাঠামোতে দক্ষগণ এই চাঁদ ব্যতীত অন্য কোন চাঁদের অস্তিত্বের বক্তা ছিলেন না। অথচ নতুন কাঠামোতে এর সংখ্যা অনেক বেশি। যেহেতু বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সূর্যের ব্যবস্থাপনায় চন্দ্রের সংখ্যা চল্লিশেরও অধিক। কিছু কিছু গ্রহের পাশে কয়েকটি চাঁদ ঘূর্ণন করছে। চাঁদ ততটা সুন্দর নয়, সাধারণ চোখে যতটা সৌন্দর্য চোখে পড়ে। কবিগণ চাঁদের অনেক সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন অথচ এ সকলই ভাসা ভাসা জ্ঞানের কথা। বাস্তবে চাঁদ সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত। এর উপরিভাগ পৃথিবী থেকেও অসমতল।

চাঁদের উপরিভাগে অসংখ্য পাহাড়, টিলা, নীচু এবং গভীর স্থান, পাহাড়ের মাঝে উপত্যকা, প্রশস্ত ময়দান, আলোহীন নিশানা ও চিহ্ন, আগ্নেয়গিরি, পাহাড় সমান

দাবানো ঢাল, বহু বর্গমাইল নিয়ে অসংখ্য গভীর খাদ ও গর্ত রয়েছে। অভিজ্ঞগণ বড় বড় দূরবীন দ্বারা প্রত্যক্ষ করার পর বলেছেন যে, চাঁদের এই দিকে যা আমাদের দিকে তাতে আগ্নেয়গিরির গর্তের সংখ্যা ষাট হাজার (৬০০০০) এর অধিক। চাঁদের এসকল গর্ত খুবই গভীর। এর কয়েকটির গভীরতা ৫৪০০ (পাঁচ হাজার চার শত) মিটার।

অভিজ্ঞগণ এও বলেছেন যে, চাঁদের উপত্যকার সংখ্যা, আমাদের দিকের পিঠে ১০,০০০ (দশ হাজারের) ও অধিক। এর মধ্যে কিছু উপত্যকা খুবই প্রশস্ত এবং কিছু সংকীর্ণ মনে হয় যেন, সেগুলো সাগর নদীর স্থান।

চাঁদের উপরিভাগে পাহাড়ের অসংখ্য ধারা, প্রত্যেক দলে অনকগুলো পাহাড় এর মধ্যে একটি দলে তিন হাজারের অধিক পাহাড়ের চুড়ার সমাবেশ রয়েছে। এ পাহাড়গুলোর মধ্যে কিছু একেবারেই উঁচু এবং কিছু কম উঁচু-এর মধ্যে কিছু পাহাড় এমনও রয়েছে যা পৃথিবীর পাহাড়ের চাইতেও উঁচু। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হিমালয়ের এভারেস্ট যা ২৯,০০০ (ঊনত্রিশ) হাজার ফুটের চাইতে একটু বেশি, যেখানে চাঁদের একটি পাহাড়ের উচ্চতা ছত্রিশ হাজার (৩৬,০০০) ফুট, এবং আরেকটি পাহাড়ের উচ্চতা আটাশ হাজার ফুট (২৮০০০)। বিজ্ঞানীগণ এ সকল পাহাড়ের নাম বিখ্যাত পণ্ডিতদের নামানুসারে রেখেছেন। যেমন ঃ এরিস্টোটল, প্লেটো, বাটলিমুস, পাকরান, কোপার্নিকাস ইত্যাদি পাহাড়।

চাঁদের দুটি অংশ সুন্দর। যা আমাদের দৃষ্টিতে আসে। বাস্তবে উহা এসকল উঁচু পাহাড়, যাতে সূর্যের আলো সুন্দরভাবে আমাদের দিকে প্রতিবিম্বিত হয়। বাকী চাঁদের উপরিভাগে আমাদের নজরে আসে কিছু কালো দাগ। এ দাগগুলো বাস্তবে দু'জিনিস। প্রথমে পাহাড় এবং টিলার কালো ছায়া যা থেকে সূর্যের আলো প্রতিবিম্বিত হতে পারে না।

পৃথিবীতে বাতাস রয়েছে, এজন্য পৃথিবীর ছায়ায় উত্তম বিশেষ আলো হয় কিন্তু চাঁদের ওপর বাতাস নেই। এজন্য ওখানে দিনের বেলায়ও ছায়ায় রাতের অন্ধকার হয়। ইহা চাঁদের কলঙ্কের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হলো ঐ প্রশস্ত ময়দান যাতে আগ্নেয়গিরির উৎস ছড়িয়ে আছে। ঐ উৎসগুলো যেহেতু কালো/অন্ধকার, এজন্য এখান থেকে সঠিকভাবে সূর্যের আলো, প্রতিবিম্বিত হয় না, এই কারণে আমাদের নিকট চাঁদের উপরিভাগে কালো দাগের মত দৃষ্টিগোচর হয়।

এ সকল কালো দাগ অর্থাৎ 'নিমজ্জিত' এর দিকে ১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল (ইসরা) এর ১২ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ـ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ـ

'আমি রাত দিনকে দুটো নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি, রাতের নিদর্শনকে আমি নিমজ্জিত করে দিয়েছি, আর দিনের নিদর্শনকে আমি করেছি আলোকময় যাতে তোমরা তোমাদের মালিকের রিযিক সংগ্রহ করতে পার। তোমরা এর মাধ্যমে বছরের গণনা ও হিসাব জানতে পার। এর সবগুলো বিষয়ই আমি খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।'

চাঁদের দৈর্ঘ্য বা গুরুত্ব ঃ চাঁদ খুবই ছোট। চাঁদ পৃথিবীর ৪৯ (ঊনপঞ্চাশ) ভাগের এক ভাগ।

চাঁদের ব্যস ঃ চাঁদের ব্যস দুই হাজার একশ ষাট (২১৬০) মাইল। যা পৃথিবীর ব্যসের চারভাগের এক ভাগ থেকে কিছু বেশি।

চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি ঃ পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি চেয়ে ছয় গুণ বেশি। চাঁদের ব্যস এবং গুরুত্ব পৃথিবীর মুকাবিলায় অনেক কম। এজন্য এর মধ্যাকর্ষণ শক্তিও অনেক কম। এর ফল এই যে, যে বস্তুর ওজন পৃথিবীতে ছয় মন হবে, চাঁদে তার ওজন এক মণ হবে। (যদিও উভয় পাল্লার বস্তুর ওজন একই হারে কমে যাবে। অর্থাৎ ছয় মন ওজনের পাথর দ্বারা ওজন করলে ছয় মণ ওজনের বস্তুই পাওয়া যাবে। তবে দুনিয়ার মানুষের নিকট তা হাল্কা মনে হবে মাত্র।)

পানি এবং হাওয়া ঃ চাঁদে পানি এবং বায়ু নেই। তা একটি বিরান এবং উষর স্থান। এরূপে চাঁদের ওপর বীজ, সব্জি, বৃষ্টি এবং জীবনের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ এ বিষয়গুলো পানি এবং বায়ুর ফলাফল এবং প্রভাবেই হয়।

শব্দের অনুপস্থিতি ঃ আমাদের মুখ থেকে যে কথাগুলো বের হয় এর মাধ্যমে বায়ুতে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। যখন উহা কানের ওপর আঘাত করে তখন আমরা শব্দ শুনতে পাই। অতএব শব্দ মূলত বায়ুর এ সকল তরঙ্গমালার নাম। আর যেহেতু চাঁদের মধ্যে বায়ু নেই, এজন্য ওখানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারের আওয়াজ শুনবে না।

চাঁদের ঘূর্ণন ঃ পৃথিবী থেকে চাঁদের মধ্যম দূরত্ব দু লক্ষ চল্লিশ হাজার (২৪০০০০) মাইল। চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চক্কর দেয়।

চাঁদের এই ঘূর্ণনকে এক চান্দ্র মাস বলা হয়। চাঁদের এই ঘূর্ণনে ২৭ দিন সাত ঘণ্টা ৩৪ মিনিট লাগে।

চাঁদের কেন্দ্রীয় ঘূর্ণন ঃ চাঁদ নিজের কেন্দ্রের ওপরও ঘোরে। চাঁদ তার কেন্দ্রীয় ঘূর্ণনের চক্রও এ সময়ে শেষ করে, যে সময়ে পৃথিবীর চার দিকে এক বার ঘোরে। চাঁদের উভয় ঘূর্ণনের সময় একই যাতে চাঁদের দিন এবং মাসের সময় একই হয়। দ্বিতীয় ফল এই যে, চাঁদের রোখ সর্বদা একই আমাদের দিকে হয় এবং দ্বিতীয় দিক আমাদের দিক থেকে গোপন থাকে। এজন্য চাঁদের একদিন আমাদের চৌদ্দ দিনের সমান এবং এক চাঁদের রাত চৌদ্দ রাতের সমান হয়। চাঁদের দিন প্রচণ্ড গরম হয় এবং এর রাত সীমাহীন ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

চাঁদের বিভিন্ন প্রকাশ ঃ যেহেতু চাঁদের নিজের আলো নেই। সে জমীনের মতই ময়লা, ধুলা, পাথুরে মাটি এবং অনুজ্জ্বল ময়দানে ভরা। সে অন্ধকার রাতের মত, আলো সূর্য থেকে অর্জন করে। চাঁদ পথিবীর দিকে আছে, এজন্য সে সূর্যের আলোকের প্রতিবিম্ব দৃষ্টিতে আসে। এ কারণে সর্বদা চাঁদের অর্ধাংশ যা সূর্যের দিকে উহা সূর্যের দ্বার আলো নজরে আসে, একই সময়ে বিপরীতে দ্বিতীয় অর্ধেক অংশ সর্বদা অন্ধকার এবং অনালোকিত হয়।

যেহেতু চাঁদ সূর্যের আলোকে প্রতিবিম্বিত করে চমকিত হয় এবং নিজস্ব আলো নেই, এজন্য আমরা চাঁদকে বিভিন্ন আকার-আকৃতি (পূর্ণ চাঁদ, নতুন চাঁদ, অর্ধ চাঁদ) ইত্যাদিতে দেখি। যদি চাঁদের নিজস্ব আলো থাকত তাহলে সর্বদা চাঁদকে পূর্ণ দেখা যেত। ৩৬ নং সূরা ইয়াসীনের ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ـ

'চাঁদের জন্য আমি বিভিন্ন চলার স্থান নির্ধারণ করেছি, পরে তা পুরে খেজুরের শাখার ন্যায় হয়।'

৮৪ নং সূরা ইনশিকাকের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ 'চাঁদের কসম, যখন তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে'।

এসকল বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, বিজ্ঞান কুরআনের বর্ণনাকেই পরিষ্কার করেছে। বিজ্ঞান যা আজ বর্ণনা করছে কুরআন তা চৌদ্দশত ত্রিশ বছর পূর্বেই বর্ণনা করেছে।

কুরআন এবং ১৯ এর প্রকৌশল ঃ এ অধ্যায়ে বিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার এর সাক্ষ্য দ্বারা কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও

কুরআন কারীমের সাথে ১৯ এর প্রকৌশল সম্পর্কে বড়ই সৌন্দর্যের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআন ঃ ইতিহাস সাক্ষী যে, যখন কোন দ্বীনের নবী এসে আল্লাহ তায়ালার বাণী দুনিয়াবাসীকে দেয় তখন লোকেরা সর্বদাই তাঁদের নিকট এ বাণীর সত্যতার জন্য প্রমাণ চেয়েছেন। এরূপে যখন সত্যের পথপ্রদর্শক শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ আগমন করেন এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর একত্ববাদ এবং স্বীয় রিসালাত এর ঘোষণা করেন তখন লোকেরা ঐ ভাবে প্রমাণ চাওয়া আরম্ভ করল যেমনভাবে পূর্ববর্তী লোকেরা করছিল। তাদের দাবি কুরআনে কারীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

২৯ নং সূরা আনকাবুত আয়াত নং - ৫০

وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۔

'এবং কাফেররা বলল- কেন তাঁর ওপর তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না?'

এসকল লোকেরা রাসূল ﷺ এর নিকট বলল যে, আপনি আসমান পর্যন্ত সিঁড়ি লাগান এবং আমাদের সামনে এর ওপরে চড়ে আল্লাহ তায়ালার কিতাব নিয়ে আসুন তখন আমরা ঈমান আনব। এ সময় ২৯ সূরা আনকাবুত, ৫০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হুজুর ﷺ কে নির্দেশ দিলেন–

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۔ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۔

'আপনি বলে দিন যে, নিদর্শন তো আল্লাহর নিকট, আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র।'

কুরআন মাজীদে কাফিরদের প্রকৃতির বাইরে নিদর্শন দাবির প্রেক্ষিতে উত্তর দিয়েছেন। ২৯ নং সূরা আনকাবুত এর ৫১ নং আয়াত–

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۔

'ঐ লোকদের জন্য এই নিদর্শন কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করি যা তাদের সামনে পড়া হয়, নিশ্চয়ই এর মধ্যে রহমত, উপদেশ রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।'

মাবুদের কালাম ঃ কুরআন মাজীদ স্বয়ং আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে দুটি প্রমাণ পেশ করে।

১. নবী করীম ﷺ নিরক্ষর ছিলেন। নবী ﷺ কারো থেকে পড়া শিখেন নি। কোথাও কোন শিক্ষাগ্রহণ করেন নি। (এ বিষয়ের সত্যায়ন অগণিত অমুসলিম ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞবানদের দ্বারা প্রমাণিত– এক কথায় এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য) এজন্য এ মহান কিতাব রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্য সম্ভবই নয়। এভাবে কুরআন মাজীদ সাক্ষ্য প্রদান করে।

২৯ নং সূরা আনকাবুত ৪৮ নং আয়াত, মহান রব ইরশাদ করেন –

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ .

'আপনি তো ইতঃপূর্বে কিতাব পড়েন নি, আর আপনি আপনার ডান হাত দ্বারা লিখেনও নি, অথচ বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করে।'

যদি নবী কারীম ﷺ জ্ঞানী হতেন এবং লেখা-পড়া জানতেন, তা হলে এ ধরনের সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত যে, নবী পাক ﷺ ইহুদী খৃস্টানদের কিতাব এবং প্লেটো এরিস্টোটলের লেখা পড়ে সুন্দর করে মিষ্টি ভাষায় কুরআন রচনা করেছেন। অথচ কুরআন মাজীদ এবং ইতিহাস এ ধরনের সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে নি।

২. কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ স্বয়ং এ কথার প্রমাণ যে, উহা আল্লাহর কালাম। উহা কাফিরদের চ্যালেঞ্জ করে যে, তোমরা পূর্ণ কুরআন মাজীদ, কিংবা কমপক্ষে এর একটি সূরা নিয়ে আস। যদি এক সূরা না পার তাহলে কুরআনের অনুরূপ একটি আয়াত নিয়ে আস। কিন্তু তোমরা সারা পৃথিবীর লোক মিলেও কুরআনের মত করে একটি আয়াতও আনতে পারবে না। কেননা ইহা আল্লাহর কালাম এবং সৃষ্টি স্রষ্টার মত কালাম আনতে পারবে না। মহান রব ২ নং সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ . وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ .

'এবং যদি তোমরা (হে কাফিরগণ) সন্দেহের মধ্যে থাক, আমি আমার বান্দার ওপর যা অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে, তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং তোমাদের সাহায্যকারীদের ডাক, আল্লাহকে ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা তা না পার এবং তোমরা কক্ষণোই তা পারবে না, তাহলে তোমরা ভয় কর সে আগুনকে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, তা নির্ধারণ করা হয়েছে কাফিরদের (কুরআন অস্বীকারকারীদের) জন্য।'

তিনি ১৭ নং সূরা বনী ইস্রাইল এর ৮৮ নং আয়াতে আরো ইরশাদ করেন–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لاَ يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

'(হে রাসূল) বলুন! যদি জ্বিন এবং ইনসান একত্রিত হয় যে, তারা এ কুরআনের মত একটা জিনিস নিয়ে আসবে, তারা আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে।'

এর বাইরেও কুরআন মাজীদ কাফিরদের বলে যে, একে অধ্যয়ন কর এবং কোন গবেষণার চোখ দিয়ে দেখ, তোমাদের মানতে হবে যে, ইহা আল্লাহর কালাম।

৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে মহান রব বলেন–

اَفَلاَيَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ـ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ـ

'এরা কি কুরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি ইহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে তারা এর মধ্যে অনেক মতানৈক্য পেত।'

কোন মানুষের লেখা যা তেইশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল একরূপ এবং এক রং এর হবে না। বিশেষতঃ যখন কোন লেখকের জিন্দেগী অগণিত সমস্যা ঘেরা থাকবে। যাকে রাজনৈতিক, সামাজিক, জীবন এবং প্রতিরোধমূলক কার্যাবলী রাত দিন যাকে পেশ করতে হয়েছে, শত্রুর রগের প্রবাহ যার বিপরীত ধারাবাহিকভাবে চলছিল। এ ধরনের মানুষের লেখার মধ্যে নিশ্চিতই কোথাও না কোথাও বিপরীত হবে, এলোমেলো, ভিন্নতা এবং উঁচু-নীচু হবে এবং ভাষা ও পরিভাষার পার্থক্য হবে অবশ্যই। অথচ কুরআন মাজীদ পুরোপুরি এক রং এক ধরনের। কোথাও কোন

মতানৈক্য নেই, বৈপরীত্য নেই, কোন অজ্ঞতা নেই। ভাষার মিষ্টতা এবং বাগ্মীতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জারী এবং চালু আছে। এভাবে কুরআন মাজীদ, ফুরকানে হামীদ স্বীয় সত্যতার চিহ্ন, অকাট্য প্রমাণ, এক জীবন্ত, অঢেল এবং নিশ্চিত মুজিযা।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাক্ষ্য ঃ বর্তমান দুনিয়ায় প্রায় ৯০ কোটি (কেউ ১০০ কোটি অন্যরা ১২০ কোটি বলে থাকেন। তবে প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানের সংখ্যা ৯০ কোটির বেশি হবে না। অনুবাদক,) এরও বেশি মুসলমান আছে এবং প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস এই যে, কুরআন মাজীদ, ফুরকানে হামীদ কিতাবে ইলাহী এবং এক স্থায়ী মুজিযা। মুসলমানদের ওপর কি আর সীমাবদ্ধ থাকবে দুনিয়ার কয়েকজন বড় বড় অমুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তিও এর মুজিযার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পাদ্রী বাসভার্থ স্মীথ বলেন–

'নিঃসন্দেহে কুরআনে হাকীম বর্ণনা, বীরত্ব ও সত্যবাদীতার এক মুজিযা।'

অন্য একজন ইংরেজ এ, জে, বেরী লিখেন ঃ

'কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমার স্বর মাধুর্যের আনন্দ এবং হৃদয়ের কম্পন শুনিয়ে দেয়।'

কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত অমুসলিম অথবা নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ একথা বলে যে, আমি আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ। এ জন্য আমি কুরআন মাজীদের ভাষার বড়ত্ব এবং শিক্ষার অনুমান করতে পারি না। যেহেতু আমরা এগুলো বুঝি না তাহলে আমরা কীভাবে বুঝব যে, কুরআন হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা একটি মুজিযা? এ ধরনের পণ্ডিত বিজ্ঞানীদের নিকট পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে যদি প্রশ্ন করি তাহলে উত্তর মিলবে যে, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে এ সৃষ্টিকুল বস্তুর একটি বিশাল পিণ্ড ছিল এবং বস্তুর একটি বিশাল বড় টুকরা ছিল, অতঃপর এই বিশাল খণ্ডের মধ্যে মহা বিস্ফোরণ ঘটলো তখন বস্তুর বড় বড় অংশ ছুটে খালি স্থানের সকল কক্ষ পথে উড়তে লাগল। এই বিস্ফোরণের ফলে আমাদের শৃঙ্খলায় সূর্য এবং গ্রহ ও নক্ষত্রগুলোও অস্তিত্বে আসে এবং সকল গ্রহ-নক্ষত্র স্ব-স্ব পথে ঘুরতে থাকে।

অতঃপর আমরা এ সকল বৈজ্ঞানিকদের নিকট জিজ্ঞেস করি আপনাদের এ বিষয়ে জ্ঞান কবে হলো? তখন সে উত্তর দেয় যে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে এ কথার আবিষ্কার হয়েছে। এরপরে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি যে, সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে বালুময় আরবের এক নিরক্ষর ব্যক্তির এ জ্ঞান ছিল। তাহলে জওয়াব আসবে কখনো নয়। তখন আমি তাকে বললাম আরবের এই নবী যিনি নিরক্ষর চৌদ্দশত ত্রিশ বছর পূর্বে এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের এই আয়াত পড়ে শুনিয়েছিলেন।

২১ নং সূরা আম্বিয়া আয়াত নং - ৩০

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا .

'অবিশ্বাসীরা কি দেখে নাই যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমিই তাদের পৃথক করেছি।'

এবং এ আয়াত ও কুরআন মাজীদে রয়েছে, যাকে এই নিরক্ষর নবী তিলাওয়াত করেছিলেন–

২১ নং সূরা আম্বিয়া ৩৩ নং আয়াত–

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۔ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ .

'তিনিই সেই সত্তা যিনি রাত-দিন ও চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকে (নিজ নিজ) কক্ষপথে ঘুরছে।'

কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদের এ আয়াতগুলো বৈজ্ঞানিকগণ এবং অভিজ্ঞ আকাশ বিজ্ঞানীদের জন্য চিন্তার আহ্বান জানায়। সে কি বুঝে না যে, বিজ্ঞান যে সমস্ত বিষয় আবিষ্কার আধুনিক যুগে করেছে ঐ সকল ঘটনার আবিষ্কার আজ থেকে ১৪০০ (চৌদ্দশত) বছরেরও পূর্বে আরবের মরুভূমির একজন নিরক্ষর নবী ﷺ এর ওপর আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের মাধ্যমে দিয়েছিলেন এবং এ নিরক্ষর নবী ঐ সময় এসকল আয়াত তিলাওয়াত করে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যার আবিষ্কার বিজ্ঞান আজ মাত্র করল।

অতঃপর কিছু দক্ষ জীববিজ্ঞানী (Biologist) এর নিকট জিজ্ঞেস করি এ পৃথিবীতে জীবন সর্বপ্রথম কোন স্থান থেকে অস্তিত্বে আসে? উত্তর আসবে কোটি কোটি বছর পূর্বে সামুদ্রিক বস্তুর মধ্যে জীবনের বস্তু আরম্ভ হয় যা থেকে এ্যামিবা (Ameba) সৃষ্টি হয় এবং এ সকল এ্যামিবা থেকে প্রকল প্রাণীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জীবনের শুরু সমুদ্র অন্য কথায় পানি থেকে, ব্যাখ্যা দানের পর জীববিদ্যার অভিজ্ঞরা এও বলবে যে, এই সত্যের জ্ঞান আধুনিক যুগে হয়েছে এবং আমি এর থেকে যদি জিজ্ঞেস করি যে, যদি এ কথার জ্ঞান আরবের মরুভূমির অধিবাসীগণ নিরক্ষর ব্যক্তি যদি আজ থেকে চৌদ্দশত ত্রিশ বছর পূর্বে পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সে না

বোধক উত্তর দিবে। আবার বলা হলো আল্লাহ তায়ালা একথার প্রকাশ তো আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে নিরক্ষর নবীর ওপর করেছিলেন। যদি সে না মানে তাহলে তাকে কুরআন মাজীদের এ আয়াত শুনান–

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াত -

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ـ اَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ ـ

'এবং আমি পানি থেকে সকল জীবিত জিনিস সৃষ্টি করেছি, সে কি বিশ্বাস করে না?'

এভাবে উদ্ভিদ বিদ্যার (Boilogist) প্রাণী বিদ্যার (Zoologist) প্রকৃতি বিদ্যার (Physicists) পণ্ডিতদের প্রশ্ন করুন যে, প্রাণী বস্তুর সৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়ম কী? সকলে এই উত্তরই দিবে যে আধুনিক যুগে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ এবং প্রাণীর সৃষ্টির পদ্ধতি এমনকি গাছপালার সৃষ্টিও জোড়ায় জোড়ায় অর্থাৎ নারী-পুরুষ থেকে হয়ে থাকে। অথচ এ সত্যের প্রকাশ আমাদের নবী কারীম ﷺ বহু বছর আগে করেছিলেন যার জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে নবী কারীম ﷺ কে প্রদান করেছিলেন। চিন্তা করুন আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ৩৬ নং সূরা ইয়াসীন এর ৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

'পবিত্র সেই সত্তা যিনি সকলকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, যা ভূমি উৎপন্ন করে। আর যা তোমাদের মধ্যে থেকে, আর যা সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই।'

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিজ্ঞান এবং মানুষ মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি আবিষ্কার থেকে কুরআন মাজীদের মুজিযাগুলোর প্রমাণ মিলে যায়, এ হলো ঐ সকল নিশানা যা মহান রব জ্ঞানবানদের জন্য স্থায়ী কিতাব কুরআন মাজীদে বারবার এসেছে। ৩০ নং সূরার ২২ নং আয়াতে–

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ـ

'নিশ্চয়ই এর মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য নিদর্শন রয়েছে।'

গণিত এক কম্পিউটারের সাক্ষ্য

কম্পিউটার বলে যে, ৬২৬০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ জন মানুষ মিলেও কুরআনের মত এত বড় কিতাব লিখতে পারবে না।

পিছনে বর্ণিত কুরআনী মুজিযাগুলো বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোকদের জন্য ছিল অথচ আজ যখন কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও গণিতে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আমাদের দেখতে হবে যে কম্পিউটারের এ যুগের জন্যও কি কুরআন মাজীদে মুজিযা রয়েছে?

'মুজিযা' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'ঐ কাজ যা মানুষের ক্ষমতা ও আওতার বাইরে।' শুকরিয়ার বিষয় হলো এই যে, এই যুগের বিজ্ঞানী, নাস্তিক এবং অমুসলমানদের ওপর বিজ্ঞান, গণিত এবং কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা এটা প্রকাশ করতে পারছি যে, কুরআন মাজীদ সর্বশেষ এবং স্থায়ী মুজিযা। গণিতের নিয়ম সর্বদা একরূপ এবং অপরিবর্তনীয় এবং কম্পিউটার ধারাবাহিক পদ্ধতিতে সত্যগুলো বর্ণনা করে। এ যুগে কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদকে সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে।

গণিতের দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআনের মুজিযা বুঝার জন্য আরবি ভাষা জানা আবশ্যক নয়। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ এ মুজিযাকে দেখার জন্য চোখ রাখবে এবং এক থেকে উনিশ পর্যন্ত গুণতে জানবে। কুরআন মাজীদের ধারা অহী অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতায় নয় বরং বর্ণনা অনুযায়ী করা হয়েছে। নবী কারীম স্বয়ং নিজ হায়াতে তাইয়েবায় এ ধারা বর্ণনা করেছেন। কুরআনের আয়াত প্রয়োজনানুযায়ী অবতীর্ণ হতে থাকে। প্রথম অহী হেরা গুহায় রমজানের ছাব্বিশ তারিখ (দিবাগত রাতে) আসে যখন হযরত জীব্রাঈল (আ) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে ইহা সাতানব্বই নম্বর সূরা। হুজুর এ অস্বাভাবিক ঘটনার পরে পেরেশান হয়ে ঘরে ফিরেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) কে পূর্ণ বক্তব্য বললেন। তিনি হুজুর কে সান্ত্বনা দিলেন।

অতঃপর হযরত আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ, তাঁর রিসালাত এবং আখিরাতের ওপর ঈমান আনার জন্য তাবলীগ শুরু করেন, যা মক্কার কাফিরদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলো না। প্রত্যুত্তরে মক্কার কাফিরগণ প্রপাগান্ডা চালালো যে মুহাম্মাদ দিওয়ানা ও পাগল (নাউযুবিল্লাহ)। মক্কার কাফিরদের এ প্রপাগান্ডার মধ্যে সূরা 'আল কলম' অবতীর্ণ হয়। কুরআন মাজীদে ইহা ৬৮ নং সূরা। এতে একথার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, তিনি পাগল এবং সাথে সাথে হুজুর কে উসওয়াতুন হাসানা (উত্তম আদর্শ) এবং উচ্চ মর্যাদাশালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অহী সূরা মুয্যাম্মিল এর কয়েকটি প্রাথমিক আয়াতের আকারে এসেছে। ইহা ৭৩ নং সূরা যার আখেরী আয়াত হলো– اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً -৭৩ নং সূরা- ৫ নং আয়াত।

আমি শীঘ্রই আপনার ওপর ভারী কালাম নাযিল করব।

নবী কারীম ﷺ ইসলামের দাওয়াতবিধি মোতাবেক চালু রাখেন। লোকেরা আস্তে আস্তে ঐ দাওয়াতের দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং বুঝতে থাকে যে, কুরআন মাজীদ কোন পাগলের প্রলাপ হতে পারে না এবং এতো সুমহান রবের মহান কালাম। কেননা এরূপ স্পষ্ট ও বাগ্মী কালাম কোন পাগলের হতে পারে না। যখন লোকেরা নবী কারীম ﷺ এবং কুরআনের সত্যতা মানতেই শুরু করল এরপর মক্কার কাফিরগণ ইহা বলতে শুরু করল যে, মুহাম্মাদ যাদুকর এবং কুরআন মুহাম্মাদের কালাম, আল্লাহর কালাম নয়। এ সময় চতুর্থ অহী আসে যা কুরআন মাজীদের ৭৪ নং সূরা মুদ্দাচ্ছির এর প্রাথমিক ৩০ আয়াত হিসেবে অবতীর্ণ হয়। হযরত জীব্রাঈল (আ) হুজুর ﷺ কে এই সূরার প্রাথমিক ২৯ আয়াত দিয়ে ৩০ তম আয়াতের দিকে মনোযোগ দেন যা হলো ৭৪ নং সূরা মুদ্দাচ্ছির, ৩০ নং আয়াত–عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ তাঁর ওপরে রয়েছে উনিশ। বিশতম এবং পঁচিশতম আয়াতে মক্কার কাফিরদের যে প্রপাগান্ডার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ যে বর্ণনা করেন তা যাদু এবং এই যে, কুরআন নবী কারীম ﷺ এর নিজের বাণী– ..... এবং ছাব্বিশতম আয়াতে মক্কার কাফিরদের এই কর্মের ওপর আল্লাহ তায়ালা নিজের রাগ ও গোস্বার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনার ওপর এরূপ অভিযোগকারীদের খুব তাড়াতাড়ি দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। ২৮ নং এবং ২৯ নং আয়াতে দোযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর মধ্যে মানুষের রং হবে কালো.... এবং এর পরেই ৩০ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ৭৪ নং সূরা ৩০ নং আয়াত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'এরপর উনিশ'।

জীব্রাঈল (আ) এখানে সূরা মুদ্দাচ্ছির এর ৩০ তম আয়াত পর্যন্ত থেমে গেলেন এবং এরপর তৎক্ষণাৎ সূরা ইকরা (আলাক) এর বাকী ১৪ আয়াত হুজুর নবী কারীম ﷺ কে দিলেন।

এ প্রশ্ন উঠেছে যে, এরূপ কেন হলো? কুরআন মাজীদের এ আয়াত 'এরপর ১৯' এর উদ্দেশ্য কি? এবং এ বিষয়টাই বা কি? মুফাস্সিরীনগণ এ আয়াতের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন দোযখের উল্লেখের পর এর আয়াত এসেছে। এজন্য এর উদ্দেশ্য ঐ ১৯ ফেরেশতা যারা দোযখে পাহারাদার। কেউ বলেন, ইহা ইসলামের ১৯টি মৌলিক ভিত্তি, কিন্তু প্রত্যেকেই লিখেছেন যে মূল বিষয়টি আল্লাহই

জানেন। এরূপ মনে হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা এ জটিলতার সমাধান বিংশ শতাব্দীর কম্পিউটারের যুগের জন্য রাখা হয়েছে। যেমন ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব্রাঈল (আ) প্রাথমিক অহী সূরা ইকরা (আলাক) এর (যার প্রথম পাঁচ আয়াত প্রথম অহীতে অবতীর্ণ হয়েছিল) বাকী ১৪ আয়াত নবী কারীম ﷺ কে দেন। এভাবে সূরা ইকরা (আলাক) এর ১৯ আয়াত পূর্ণ হয়ে গেল। অর্থাৎ সূরা মুদ্দাসসির-এর عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'এরপর উনিশ' বলার পর তৎক্ষণাৎ উনিশ আয়াতের সূরা ইকরা পূর্ণ হয়ে গেল।

১৯ এর প্রকৌশল

মহান রব এর ঘোষণা ঃ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'এরপর উনিশ' ৭৪ নং সূরা মুদ্দাসসির এর ৩০ নং আয়াত।

এই ১৯ এর প্রকৌশল এর কিছু ব্যাখ্যার দিকে গেলে হতভম্ব করা কথাবার্তা সামনে আসবে। এমন মানব মস্তিষ্ক কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার ঘেরাও এর মধ্যে ডুবে যায় এবং হৃদয় অজান্তে বলে উঠে যে, এই কিতাব ... এই কুরআন ... কোন মানুষের বাণী নয় বরং ইহা রহমান, রাহীম এর বাণী। কিছু ব্যাখ্যা পেশ করা হলো–

১. সূরা আলাক এর ১ম পাঁচ আয়াতে ১৯টি শব্দ এবং ঐ উনিশ শব্দের মধ্যে ৭৬ টি অক্ষর যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি ভাগ হয়ে যায়। ৭৬ ÷ ১৯ = ৪

গুণের উদাহরণ ১৯ × ৪ = ৭৬।

যোগের উদাহরণ ১৯ + ১৯ + ১৯ + ১৯ = ৭৬

২. কুরআন মাজীদ ১১৪ টি সূরা আছে, এ সংখ্যাও ১৯ দ্বারা পূর্ণভাবে ভাগ করা যায়।

ভাগের উদাহরণ ১১৪ ÷ ১৯ = ৬

গুণের উদাহরণ ১৯ × ৬ = ১১৪

৩. কুরআন মাজীদের সূরাগুলো উল্টোদিক থেকে অর্থাৎ ১১৪ নং সূরা নাস, ১১৩ নং সূরা ফালাক, ১১২ নং সূরা ইখলাস, এভাবে গুণে আসলে ১৯ নং সূরা অর্থাৎ ৯৬ নং সূরাটি পড়ে সূরা আলাক।

৪. একথা কি পরিমাণ গুরুত্ব রাখে যে, কুরআন মাজীদের শুরু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। সূরা, যার মধ্যে ১৯টি অক্ষর বা হরফ রয়েছে। এর মধ্যে চারটি শব্দ ঃ ১. اسم ২. الله ৩. الرحمن ৪. الرحيم। এ আয়াতের প্রত্যেক শব্দ যতবার কুরআন মাজীদ এসেছে উহা ১৯ দ্বারা বিভক্ত।

প্রথম শব্দ اسم। কুরআন মাজীদে ১৯ বার এসেছে। দ্বিতীয় الله। কুরআন মাজীদে ২৬৯৮ বার এসেছে। যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য ঃ

ভাগের উদাহরণ ২৬৯৮ ÷ ১৯ = ১৪২

গুণের উদাহরণ ১৯ × ১৪২ = ২৬৯৮

তৃতীয় শব্দ الرحمن। ৫৭ বার এসেছে যা ১৯ দ্বারা পূর্ণভাবে বিভাজ্য। ভাগের উদাহরণ ৫৭ ÷ ১৯ = ৩ গুণের উদাহরণ ১৯×৩=৫৭ চতুর্থ শব্দ الرحيم। একশত চৌদ্দ বার এসেছে, যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য ঃ

ভাগের উদাহরণ ১১৪ ÷ ১৯ = ৬

গুণের উদাহরণ ১৯ × ৬ = ১১৪

চিন্তা করুন চার শব্দের সংখ্যাই ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য। এ ধরনের হওয়া সাধারণ বিষয় নয়।

৫. بسم الله الرحمن الرحيم আয়াত সূরা আন নামলে দুবার এসেছে। একবার শুরুতে এবং দ্বিতীয়বার ভিতরে। ... এ জন্য সূরা তাওবার শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم নেই, অন্যথায় এর সংখ্যা ১১৫ হয়ে যেত এবং ১১৫ সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হতো না (কুরআন মাজীদে সমগ্র সূরার সংখ্যা ১১৪ এবং সূরা তাওবাহ ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে بسم الله الرحمن الرحيم আছে।

৬. কুরআন মাজীদের ২৯টি সূরার শুরু হরফ দ্বারা হয়েছে অর্থাৎ হরূফে মুকাত্তায়াত দ্বারা হয়েছে। আরবি ভাষার ২৮ হরফের ১৪টি বর্ণ বিভিন্ন জোড়ের মাধ্যমে এ সূরাগুলোর শুরুতে অবস্থান নিয়েছে। এ হরফগুলো নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. الف ২. ح ৩. ر ৪. س ৫. ص ৬. ط ৭. ع ৮. ق ৯. ك ১০. ل ১১. م ১২. ن ১৩. ه ১৪. ى।

এ ১৪ হরফ দ্বারা যে ১৪ সেট হরুফে মুকাত্তায়াত তৈরি হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১. এক হরফবিশিষ্ট

১. ص ২. ق ৩. ن ৩ সেট

২. দুই হরফবিশিষ্ট ঃ

১. طه ২. يس ৩. طس ৪. حم ৪ সেট

৩. তিন হরফবিশিষ্ট ঃ

১. الم ২. الر ৩. طسم ৪. عسق ৪ সেট।

৪. চার হরফবিশিষ্ট

১. المر ২. المص ২ সেট

৫. পাঁচ হরফবিশিষ্ট ঃ

১. كهيعص ১ সেট

উল্লিখিত চিত্রের ওপর এবার চিন্তা করুন, বুঝা যায় যে, হরফে মুকাত্তায়াত য
২৯ সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে, এগুলোর সংখ্যা ১৪টি এবং তাদের সেট সংখ্য
১৪টি, এখন ১৪ হরফ + ১৪ সেট + ২৯ সূরা = ৫৭ সর্বমোট সংখ্যা ৫৭ ও ১:
দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৫৭ ÷ ১৯ = ৩

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৩ = ৫৭

যোগের উদাহরণ ঃ ১৯ + ১৯ + ১৯ = ৫৭

৭. হরফে মুকাত্তায়াত এর মধ্যে ق নিন। এই হরফ ق দুই সূরার প্রথা
এসেছে, অর্থাৎ সূরা ق এবং সূরা শূরা حم عسق এর আকারে। এগুলোর প্রত্যে
সূরায় ق হরফটি ৫৭ বার এসেছে, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৫৭ ÷ ১৯ = ৩

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৩ = ৫৭

সূরা ق এ-ও ق হরফটি ৫৭ বার এসেছে এবং حم عسق সূরার মধ্যেও
হরফটি ৫৭ বার এসেছে, যদিও শেষোক্ত সূরাটি অনেক দীর্ঘ।

উভয় সূরার মধ্যে ق এর সমষ্টি ১১৪ এবং কুরআন মাজীদে সূরা সংখ্য
১১৪টি। অর্থাৎ কুরআন মাজীদে ১১৪টি সূরা রয়েছে এবং ق হরফ যা কুরত
মাজীদের প্রথম হরফ এবং তার নামের প্রতিনিধিত্ব করে উহাও ১১৪ বার এসে
এভাবে এ কথা বলা বৈধ হবে যে, কুরআনের ঐশী আকারের হিসাবের ব্যবস্থা ১
সূরার ওপর হয়েছে।

৮. কুরআন মাজীদে অতীতকালের গোত্রগুলোকে قوم শব্দ দ্বারা বর্ণনা ক
হয়েছে। যেমন ঃ قوم نوح، قوم ثمود অথচ সূরা ق এর ১৩ নং আয়াতে ভ
কুরআন বর্ণনা করেন وعاد وفرعون واخوان لوط (এখানে) اخوان لوط ব
কারণ, হযরত লূত (আ) এর কওম এর উল্লেখ কুরআনে قوم শব্দ দ্বারাই সাধার
উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ শুধুমাত্র এ আয়াতে قوم শব্দের পরিবর্তে ا
বিশেষভাবে কেন ব্যবহার করা হলো?

এর কারণ এই যে, যদি এখানে قوم শব্দটি ব্যবহার করা হতো তাহলে এক
বেড়ে যেত এবং এই সূরায় ق হরফের ব্যবহার ৫৭ এর পরিবর্তে ৫৮ হয়ে
তাহলে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হতো না। এভাবে কুরআনের হিসাবের নিয়
ব্যতিক্রম হয়ে যেত।

৯. সূরা আল কলম এর শুরুতে ن হরফ এসেছে এ সূরায় ن হরফটি ১৩৩ বার এসেছে। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৩৩ ÷ ১৯ = ৭

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৭ = ১৩৩

১০. হরফ ص টি কুরআন মাজীদের তিন সূরার প্রথমে এসেছে। সূরা আল আরাফে المص। এর আকৃতিতে,

সূরা মারিয়ামে كهيعص এর আকৃতিতে,

সূরা হুদে ص এর আকৃতিতে এই সূরার মধ্যে ব্যবহৃত ص এর সংখ্যা ১৫২ যাকে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায়।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৫২ ÷ ১৯ = ৮

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৮ = ১৫২

১১. সূরা আল আরাফের ৬৯ তম আয়াতে একটি শব্দ بسطة এসেছে। আরবি এ শব্দ س দ্বারা লেখা যায় কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন এ নির্দেশও ছিল যে শব্দকে ص দ্বারা লেখা যাবে, এর কারণ কি ছিল?

কারণ এই ছিল যে, যদি এই শব্দ س দ্বারা লেখা হয় এ অবস্থায় একটি ص কম হয়ে যায় এবং উল্লিখিত সূরাগুলোতে ص হরফের পূর্ণ সংখ্যা ১৫২ এর পরিবর্তে ১৫১ হয়ে যায় যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না এবং কুরআনে কারীমের হিসাবি নিয়ম ভুল হয়ে যাবে।

১২. যে সকল সূরার শুরুতে এক হরফের অধিক হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা। এ সূরা গুলোর মধ্যে প্রত্যেক হরফ পৃথক পৃথক জমা করা যায়, তাহলে এর সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। শুধু এই নয় বরং এ হরূফগুলোর স্ব স্ব সংখ্যা যদি একত্র করা হয় তাহলেও সামগ্রিক সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে।

(ক) সূরা طه এর মধ্যে দু হরফ ط এবং ه আছে। এ সূরায় ط অক্ষরটি ২৮ বার এবং ه ৩১৪ বার এসেছে এবং উভয়ের সমষ্টি ৩৪২ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৩৪২ ÷ ১৯ = ১৮

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১৮ = ৩৪২

(খ) সূরা ইয়াসীনে ي আছে ২৩৭ বার এবং س আছে ৪৮ বার এবং উভয়ের সমষ্টি ২৮৫ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ২৮৫ ÷ ১৯ = ১৫

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১৫ = ২৮৫

আরো একটি বিস্ময়কর হাকীকত

কুরআন মাজীদের ২৯ সূরার শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তায়াত আছে এবং এ সূরাগুলো যতবার এ সূরাগুলোতে এসেছে এদের সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। বিস্তারিত নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
বাকারা	الم	৯৯৯১	বার
আলে ইমরান	الم	৫৭১৪	বার
আন কাবুত	الم	১৬৮৫	বার
রূম	الم	১২৫৯	বার
লুকমান	الم	৮২৩	বার
সাজদাহ্	الم	৫৮০	বার
রা'দ	المر (ر কে বাদ দিয়ে)	১৩৬৪	বার
আরাফ	المص (ص কে বাদ দিয়ে)	৫২৬০	বার

যোগ ফল ঃ ২৬৬৭৬ বার

এ সমগ্র সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ২৬৬৭৬ ÷ ১৯ = ১৪০৪

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১৪০৪ = ২৬৬৭৬

২. হরূফে মুকাত্তায়াত الر নিম্নোক্ত সূরাসমূহের পূর্বে এসেছে। এ সূরাগুলোর মধ্যে এ হরফগুলোর সংখ্যার সমষ্টি নিম্নে দেয়া হলো এবং সূরা رعد এর ر এর হিসাব এর টোটালের সঙ্গে যোগ করা হলো–

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
ইউনুস	الر	২৫২২	বার
হুদ	الر	২৫১৪	বার
ইউসুফ	الر	২৪০৫	বার
ইবরাহীম	الر	১২০৬	বার
হিজর	الر	৯২৫	বার
রা'দ	المر (শুধু ر)	১৩৫	বার

যোগ ফল ঃ ৯৭০৯

এই ৯৭০৯ সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য

ভাগের উদাহরণ ঃ ৯৭০৯ ÷ ১৯ = ৫১১

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৫১১ = ৯৭০৯

৩. নিম্নলিখিত সূরাগুলোতে حم হরফ প্রথমে এসেছে। এদের সংখ্যা = ০৭ বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
মুমিন	حم	৪৫৩	বার
হামীম আসসাজদা	حم	৩৩৪	বার
যুখরুফ	حم	৩৬২	বার
দুখান	حم	১৬১	বার
জাছিয়া	حم	২৩১	বার
আহকাফ	حم	২৬৪	বার
শূরা	حم عسق	৩৬১	বার (শুধু ح এবং م)

মোট সংখ্যা ২১৬৬

২১৬৬ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য

ভাগের উদাহরণ ঃ ২১৬৬ ÷ ১৯ = ১১৪

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১১৪ = ২১৬৬

৪. সূরা শূরার মধ্যে পাঁচ হরুফ حم عسق রয়েছে।

এ পাঁচ হরফ ق، س، ع، م، ح এ সূরার মধ্যে সর্বমোট ৫৭০ বার রয়েছে। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য ঃ

ভাগের উদাহরণ ঃ ৫৭০ ÷ ১৯ = ৩০

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৩০ = ৫৭০

৫. নিম্নলিখিত সূরাগুলোর মধ্যে ط এর س হরফ এসেছে। এর মোট সংখ্যার ওপর চিন্তা করি

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
নামল	طس	১২০	বার
শূয়ারা	طسم	১২৬ বার (م বাদ দিয়ে)	
কাসাস	طسم	১১৯ বার (م বাদ দিয়ে)	

ত্বহা	طه	২৮ বার (ہ বাদ দিয়ে)
يس	يس	৪৮ বার (ى বাদ দিয়ে)
শূরা	حم عسق	৫৩ বার (শুধু س বাদ দিয়ে)

মোট সংখ্যা = ৪৯৪

৪৯৪ সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৪৯৪ ÷ ১৯ = ২৬

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ২৬ = ৪৯৪

৬. সূরা ص এ ص হরফটি ২৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আরাফের শুরু المص। দ্বারা হয়। এ সূরার ص আটানব্বই বার এসেছে। সূরা মারইয়ামের শুরু كهيعص দ্বারা, এ সূরায় ص হরফ ২৬ বার এসেছে। বিশ্লেষণ করি–

সূরা	হরফ	সংখ্যা
ص	ص	২৮ বার
আরাফ	ص	৯৮ বার
মারইয়াম	ص	২৬ বার

মোট সংখ্যা ঃ ১৫২

১৫২ দ্বারা সংখ্যাটি নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৫২ ÷ ১৯ = ৮

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৮ = ১৫২

৭. সূরা মারইয়ামের শুরুতে كهيعص দ্বারা হয়েছে। এ সূরায় এ সকল হরফের সংখ্যা

হরফ	সংখ্যা	
ك	১৩৭ বার	
ه	১৬৮ বার	মোট সংখ্যা ৭৯৮
ى	৩৪৫ বার	এ ৭৯৮ সংখ্যাটি
ع	১২২ বার	১৯ দ্বারা নিঃশেষে
ص	২৬ বার	বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৭৯৮ ÷ ১৯ = ৪২

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৪২ = ৭৯৮

৮. যেমন প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদে ২৯ সূরায় হরূফে মুকাত্তায়াত এসেছে। হতভম্ব হওয়ার প্রান্তসীমায় গিয়ে আমরা দেখতে পাই এ সকল সূরার প্রত্যেক হরফকে আলাদা আলাদা যোগ করা হলে, প্রত্যেক হরফের সংখ্যার সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

(ক) এ ২৯টি হরফে মুকাত্তায়াত বিশিষ্ট সূরাগুলোতে الف। এর সংখ্যা ১৭৪৯৯ বার। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৭৪৯৯ ÷ ১৯ = ৯২১

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৯২১ = ১৭৪৯৯

(খ) এ ২৯টি সূরায় ل হরফ এসেছে ১১৭৮০ বার। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১১৭৮০ ÷ ১৯ = ৬২০

গুণের উদাহরণ ঃ ৬২০ × ১৯ = ১১৭৮০

(গ) এ ২৯টি সূরায় م এর মোট সংখ্যা ৮৬৮৩ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৮৬৮৩ ÷ ১৯ = ৪৫৭

গুণের উদাহরণ ঃ ৪৫৭ × ১৯ = ৮৬৮৩

(ঘ) এ ২৯টি সূরায় ر হরফটি এসেছে ১২৩৫ বার যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১২৩৫ ÷ ১৯ = ৬৫

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৬৫ = ১২৩৫

(ঙ) এ ২৯টি সূরায় ص হরফটি এসেছে ১৫২ বার। ১৫২ সংখ্যাটি ২৯ দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৫২ ÷ ১৯ = ৮

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৮ = ১৫২

(চ) এ ২৯টি সূরার ح হরফটি এসেছে ৩০৪ বার যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ৩০৪ ÷ ১৯ = ১৬

গুণের উদাহরণ ১৯ × ১৬ = ৩০৪

(ছ) এ ২৯টি সূরায় ق হরফটি এসেছে ১১৪ বার যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১১৪ ÷ ১৯ = ৬

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৬ = ১১৪

(জ) এ ২৯টি সূরায় ن হরফটি এসেছে ১৩৩ বার, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৩৩ ÷ ১৯ = ৭

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৭ = ১৩৩

৯. ১৯ এর সংখ্যাগত প্রকৌশলটি ১ এবং ৯ দ্বারা গঠিত। যা আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুণের দিকে সম্পৃক্ত। এক আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রকাশ এবং নয় সংখ্যাটি আল্লাহর অদৃশ্য গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব ১৯ এর সংখ্যা যা ১ এবং ৯ এর মিলিত রূপ, তা আল্লাহর তায়ালার দুটি গুণ জাহির (প্রকাশ) এবং বাতিন (অপ্রকাশ্য)কে বুঝায়।

হিসাবের দিক থেকে ১ এর পূর্বে কোন সংখ্যা নেই এবং ৯ এর পরেও কোন একক সংখ্যা নেই। অর্থাৎ ১৯ এর সংখ্যা প্রথম এবং শেষ এর নির্দেশক। সম্ভবতঃ এ জন্যই কুরআনের হিসাবী ব্যবস্থা এ সংখ্যার ভিত্তিতে রাখা হয়েছে।

(এর বাইরেও পরবর্তী গবেষণায় আরো অনেক সংখ্যাগত অথবা অন্য প্রকারের অলৌকিক বিষয়াবলী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা থেকে বের হয়ে আসতে পারে। এ জন্য আমরা আমাদের বিশ্বাসকে আল-কুরআনের ওপরই ভিত্তিশীল রাখবো। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেহেতু কুরআনের মুজিযাই প্রকাশ করছে আমরা সেহেতু এগুলো বিশ্বাস করি, তবে যদি কখনো বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা বিকৃতির চেষ্টা করা হয়। আমরা কুরআনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে তা প্রতিহত করার জন্যও সর্বদা প্রস্তুত থাকবো ইনশা আল্লাহ– অনুবাদক)

উপসংহার ঃ এ সকল বিশ্লেষণ থেকে একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, কুরআন মাজীদের হিসাবী ব্যবস্থাপনা এত পেঁচানো অথচ সুশৃঙ্খল যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে নয়। ইলাহী হিকমতের দ্বারা এর এক এক শব্দ নিয়ন্ত্রিত। বাস্তবে এ সকল গাণিতিক ধারা হতভম্বকারী এবং নিঃসন্দেহে সকল জ্বিন এবং ইনসান মিলেও এ ধরনের জ্ঞানকে হতভম্বকারী কিতাব লেখা সম্ভব নয়।

এ ধারায় পুরা কুরআন মাজীদকে সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। এরপর কম্পিউটারের নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, যদি মানুষ এ ধরনের কিতাব

লিখতে চায় তাহলে কতবার চেষ্টা করার দ্বারা একথা বা কাজ করা সম্ভব? কম্পিউটার জবাব দিয়েছে, "৬২৬০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০" বার চেষ্টা করার প্রয়োজন হবে। এক বাক্যে বলতে হবে এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, কোন মানুষ অথবা দুনিয়ার সকল মানুষ এবং জ্বিন মিলেও এরূপ কিতাব লিখবে। মহান রব ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরা) এর ৮৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

বলুন ঃ (হে মুহাম্মদ সা.) যদি জ্বিন, ইনসান এ বিষয়ের ওপর একত্রিত হয় যে, এ কুরআনের অনুরূপ আরেকটি রচনা করবে, তারা তা করতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে।

(১৪০০ বছরেরও ওপরে চলছে আল কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ। আজ পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে এগিয়ে আসে নি। এগিয়ে অসে নি কোন আরব অনুরূপ এক সাহিত্য রচনা করতে, এগিয়ে আসে নি কোন বিজ্ঞানী কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভুল ধরতে, এগিয়ে আসে নি কোন দার্শনিক কুরআনে বর্ণিত দর্শন তত্ত্বের ভুল প্রমাণে। তবে এ পর্যন্ত যারাই কুরআন গবেষণায় লিপ্ত হয়েছেন অথবা কুরআনকে বিশ্লেষণ করে এর ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, তারাই কুরআনের অলৌকিক মুজিযা দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন ঃ

لَيْسَ هٰذَا بِكَلَامِ الْبَشَرِ ـ

ইহা কোন মানুষের বাণী নয়। আসুন না আমরা এ কুরআনের পূর্ণ অনুসরণ করে আলোকিত হই। (অনুবাদক)

সমাপ্ত